সূচি

বিনা'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি		০১
এক নজরে বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তি (কমোডিটি)		০৬
ধান		
ধানের জাত:	বিনাশাইল	১৩
	বিনাধান-৪	১৪
	বিনাধান-৫	১৪
	বিনাধান-৬	১৪
	বিনাধান-৭	১৫
	বিনাধান-৮	১৬
	বিনাধান-৯	১৬
	বিনাধান-১০	১৭
	বিনাধান-১১	১৮
	বিনাধান-১২	১৮
	বিনাধান-১৩	১৯
	বিনাধান-১৪	২০
	বিনাধান-১৫	২১
	বিনাধান-১৬	২১
	বিনাধান-১৭	২২
	বিনাধান-১৮	২৩
	বিনাধান-১৯	২৩
	বিনাধান-২০	২৪
	বিনাধান-২১	২৫
	বিনাধান-২২	২৫
	বিনাধান-২৩	২৬
	বিনাধান-২৪	২৭
	ধানের উৎপাদন প্রযুক্তি	২৮
গম		
গমের জাত:	বিনাগম-১	৩৫
	গমের উৎপাদন প্রযুক্তি	৩৬
পাট		
পাটের জাত:	এটমপাট-৩৮	৩৮
	বিনাদেশিপাট-২	৩৮
	পাটের উৎপাদন প্রযুক্তি	৩৯
	বিনাপাটশাক-১	৪১
	চাষাবাদ পদ্ধতি	৪১
তেল ফসল		
সরিষা		
সরিষার জাত:	সফল	৪৪
	অগ্রণী	৪৪
	বিনাসরিষা-৩	৪৪
	বিনাসরিষা-৪	৪৫
	বিনাসরিষা-৫	৪৫
	বিনাসরিষা-৬	৪৬
	বিনাসরিষা-৭	৪৬
	বিনাসরিষা-৮	৪৬
	বিনাসরিষা-৯	৪৬
	বিনাসরিষা-১০	৪৭
	সরিষার উৎপাদন প্রযুক্তি	৪৭
চীনাবাদাম		
চীনাবাদামের জাত:	বিনাচীনাবাদাম-১	৫১
	বিনাচীনাবাদাম-২	৫১
	বিনাচীনাবাদাম-৩	৫১
	বিনাচীনাবাদাম-৪	৫২
	বিনাচীনাবাদাম-৫	৫২
	বিনাচীনাবাদাম-৬	৫৩
	বিনাচীনাবাদাম-৭	৫৪

	বিনাচীনাবাদাম-৮	৫৪
	বিনাচীনাবাদাম-৯	৫৪
	বিনাচীনাবাদাম-১০	৫৫
	চীনাবাদামের উৎপাদন প্রযুক্তি	৫৫
তিল		
তিলের জাত:	বিনাতিল-১	৬০
	বিনাতিল-২	৬১
	বিনাতিল-৩	৬১
	বিনাতিল-৪	৬২
	তিলের উৎপাদন প্রযুক্তি	৬২
সয়াবিন		
সয়াবিনের জাত:	বিনাসয়াবিন-১	৬৫
	বিনাসয়াবিন-২	৬৬
	বিনাসয়াবিন-৩	৬৬
	বিনাসয়াবিন-৪	৬৭
	বিনাসয়াবিন-৫	৬৭
	বিনাসয়াবিন-৬	৬৮
	সয়াবিনের উৎপাদন প্রযুক্তি	৬৯
ডাল ফসল		
মসুর		
মসুরের জাত:	বিনামসুর-১	৭৩
	বিনামসুর-২	৭৩
	বিনামসুর-৩	৭৩
	বিনামসুর-৪	৭৪
	বিনামসুর-৫	৭৪
	বিনামসুর-৬	৭৫
	বিনামসুর-৭	৭৫
	বিনামসুর-৮	৭৫
	বিনামসুর-৯	৭৬
	বিনামসুর-১০	৭৬
	বিনামসুর-১১	৭৬
	মসুরের উৎপাদন প্রযুক্তি	৭৭
মুগ		
মুগের জাত:	বিনামুগ-১	৭৯
	বিনামুগ-২	৭৯
	বিনামুগ-৩	৭৯
	বিনামুগ-৪	৭৯
	বিনামুগ-৫	৮০
	বিনামুগ-৬	৮০
	বিনামুগ-৭	৮০
	বিনামুগ-৮	৮১
	বিনামুগ-৯	৮১
	বিনামুগ-১০	৮১
	মুগের উৎপাদন প্রযুক্তি	৮৩
ছোলা		
ছোলার জাত:	হাইপ্রোছোলা	৮৬
	বিনাছোলা-২	৮৬
	বিনাছোলা-৩	৮৬
	বিনাছোলা-৪	৮৭
	বিনাছোলা-৫	৮৭
	বিনাছোলা-৬	৮৭
	বিনাছোলা-৭	৮৮
	বিনাছোলা-৮	৮৮
	বিনাছোলা-৯	৮৮
	বিনাছোলা-১০	৮৯
	ছোলার উৎপাদন প্রযুক্তি	৮৯
মাষকলাই		
মাষকলাই এর জাত:	বিনামাষ-১	৯২
	মাষকলাই এর উৎপাদন প্রযুক্তি	৯২
খেসারি		
খেসারির জাত:	বিনাখেসারি-১	৯৪
	খেসারির উৎপাদন প্রযুক্তি	৯৪

সবজি ফসল

টমেটো

টমেটোর জাত:	বাহার	৯৬
	বিনাটমেটো-২	৯৭
	বিনাটমেটো-৩	৯৭
	বিনাটমেটো-৪	৯৭
	বিনাটমেটো-৫	৯৭
	বিনাটমেটো-৬	৯৮
	বিনাটমেটো-৭	৯৮
	বিনাটমেটো-৮	৯৮
	বিনাটমেটো-৯	৯৮
	বিনাটমেটো-১০	৯৮
	বিনাটমেটো-১১	৯৯
	বিনাটমেটো-১২	৯৯
	বিনাটমেটো-১৩	১০০
	টমেটোর উৎপাদন প্রযুক্তি	১০০

লেবু

লেবুর জাত:	বিনালেবু-১	১০২
	বিনালেবু-২	১০৩

মসলা ফসল

রসুন

রসুনের জাত:	বিনারসুন-১	১০৪
	রসুনের উৎপাদন প্রযুক্তি	১০৪

মরিচ

মরিচের জাত:	বিনামরিচ-১	১০৭
	বিনামরিচ-২	১০৭
	মরিচের উৎপাদন প্রযুক্তি	১০৮

পিঁয়াজ

পিঁয়াজের জাত:	বিনাপিঁয়াজ-১	১০৯
	বিনাপিঁয়াজ-২	১০৯
	পিঁয়াজের উৎপাদন প্রযুক্তি	১১০

হলুদ

হলুদের জাত:	বিনাহলুদ-১	১১২
	হলুদের উৎপাদন প্রযুক্তি	১১৩

জীবাণু সার

জীবাণু সারের নাম	ফসলের নাম	১১৫
বিনা-এলটি-১৮	মসুর	১১৬
বিনা-সিপি-২	ছোলা	১১৬
বিনা-এমবি-১	মুগ	১১৬
বিনা-সিওপি-৭	বরবটি	১১৬
বিনা-জিএন-২	চীনাবাদাম	১১৬
বিনা-এসবি-৪	সয়াবিন	১১৬
বিনা-বিজি-১	মাষকলাই	১১৭
বিনা-ডিসি-৯	ধৈঞ্চা	১১৭
বিনা জীবাণু সার-১০	ফেলন	১১৭

ফসকো-ভার্মিকম্পোস্ট ১১৮

ননকমোডিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ১১৯

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রতিষ্ঠা

১৯৬১ সালে ঢাকাস্থ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রথম কৃষি গবেষণা কর্মকান্ড শুরু হয় এবং এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ১লা জুলাই ১৯৭২ সালে একটু বড় পরিসরে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ঢাকা থেকে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সালে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) কেন্দ্রটি-কে অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় স্বতন্ত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামে জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ১৯৯৬ সালে উক্ত অধ্যাদেশ সংশোধিত হয়। অতঃপর ১৮ মে ২০১৭ সালে বিনা আইন অনুমোদিত হয়।

অবস্থান

ময়মনসিংহ শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ৩৩ একর পরিমিত জায়গা জুড়ে বিনা'র অবকাঠামোগত এবং খামার সুবিধা গড়ে উঠেছে। এছাড়া ময়মনসিংহ শহরের গলগন্ডা এলাকায় ৮.২ একর এলাকায় এর পুরাতন আবাসিক এলাকা রয়েছে।

মর্যাদা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ব্যবস্থাপনা

ক. নীতি নির্ধারণ: ইনস্টিটিউট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ম্যানেজমেন্ট বোর্ড রয়েছে। এই বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতি।

খ. নির্বাহী প্রধান: মহাপরিচালক

গ. ব্যয় নির্বাহ: বেতন, ভাতা, গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় সরকারি রাজস্ব খাত থেকে নির্বাহ করা হয়। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি থেকেও বরাদ্দ পাওয়া যায়।

গবেষণা বিভাগসমূহ

বিনা'য় ১১টি গবেষণা বিভাগ আছে, যথা: উদ্ভিদ প্রজনন; ক্রপ ফিজিওলজি; মৃত্তিকা বিজ্ঞান; কীটতত্ত্ব; উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব; কৃষিতত্ত্ব; কৃষি প্রকৌশল; ফলিত গবেষণা ও সম্প্রসারণ; বায়োটেকনোলজি; উদ্যানতত্ত্ব ও কৃষি অর্থনীতি বিভাগ।

সহায়তাকারী শাখাসমূহ

খামার, প্রকৌশল, ইলেক্ট্রনিক্স, গ্রন্থাগার, প্রশাসন (জন ব্যবস্থাপনা ও সাপোর্ট সার্ভিস), হিসাব, সংগ্রহ ও ভান্ডার শাখা আছে। এছাড়া সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষ আছে।

উপকেন্দ্র

বিভিন্ন অঞ্চল ও জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিনা'র ১৩টি উপকেন্দ্র আছে, যথা- বিনা উপকেন্দ্র ঈশ্বরদী, রংপুর, কুমিল্লা, মাগুরা, সাতক্ষীরা, জামালপুর, খাগড়াছড়ি, সুনামগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নোয়াখালী।

জনবল

বিনা'য় একজন মহাপরিচালক, তিনজন পরিচালক- পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস), পরিচালক (গবেষণা) এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা)সহ ১৭০ জন বিজ্ঞানী, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা যথাক্রমে ৩৬ জন ও ৪০ জন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ৩২৮ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ৫৭৮টি পদ রয়েছে।

ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য

গবেষণা

ক. পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করত: উন্নতমানের অধিক ফলনশীল ধান, পাট, গম, ডাল, তেলবীজ, সব্জি ও মসলা জাতীয় শস্যের জাত উদ্ভাবন, মাটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণ, বিভিন্ন ফসলের জন্য সার সুপারিশমালা প্রণয়ন, রোগ ও পোকামাকড় দমনের পদ্ধতি নির্ণয়, সুষ্ঠু সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নতুন জাতসমূহের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো, আর্থ-সামাজিক গবেষণা এবং কৃষকদের নিকট উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর করা।

খ. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় এবং একে অন্যের সম্পূরক হিসেবে কাজ করা।

শিক্ষা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের কৃষি গবেষণায় পরমাণু শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান এবং এমএস ও পিএইচডি ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত কমোডিটি ও নন-কমোডিটি প্রযুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

কমোডিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

বিনা এ যাবৎ ধান, পাট, গম, ডাল, তেলবীজ, সব্জি ও মসলা জাতীয় শস্যের ১৮টি ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন ১১২টি জাত উদ্ভাবন করেছে। ফসলের উন্নত এ জাতগুলো ছাড়াও ডাল ও শিম জাতীয় তেল ফসলের নাইট্রোজেনের বিকল্প হিসেবে ইনস্টিটিউট থেকে ৯টি জীবাণুসার উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে ছোলা, মসুর, চিনাবাদাম, সয়াবিন, মুগ, মাষকলাই, বরবটি ও ধৈঞ্চা'র জীবাণুসার ইনস্টিটিউট থেকে তৈরি এবং সরবরাহ করা হচ্ছে। এ সকল জীবাণুসার প্রয়োগে সয়াবিনে ৭৫-১৫০%, অন্যান্য ডাল ও শিম জাতীয় শস্যে ২০-৪৫% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি পায়। জীবাণু সার প্রয়োগ করলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন হয় না। ফসফো-ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে মৃত্তিকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং

ফসফেটিক সারসহ অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাশ্রয় হয়।

নন-কমোডিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

জাতীয় সার সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং উপজেলা সার নির্দেশিকা তৈরীতে বিনা'র উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ফসলের উন্নত উৎপাদন কৌশল, লাভজনক শস্যবিন্যাস এবং অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তি (৪৭টি প্রযুক্তি/কলাকৌশল) এ ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে:

- প্রধান প্রধান শস্য পরিক্রমায় সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা
- ধান ভিত্তিক শস্য পরিক্রমায় ফসফেট সার ব্যবস্থাপনা
- ধান চাষে নাইট্রোজেন সারের ব্যবস্থাপনা
- পটাশ সার ব্যবস্থাপনা
- সালফার ও জিংক সার ব্যবস্থাপনা
- নাইট্রোজেন সার মাত্রা
- ফসফেটিক জীবাণু সার
- লবণাক্ত জমিতে গম চাষ
- মাটিতে দস্তার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়
- আইল ব্যবস্থাপনা ও সম্পুরক সেচের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে আউশ ও আমন ধান চাষ
- লাভজনক এবং পানি সাশ্রয়ী শস্য বিন্যাস (ময়মনসিংহ)
- উফশী সরিষাজাত সফল ও অগ্রণীর জন্য সেচ অনুসূচি
- স্বল্প সেচে শস্য বিন্যাস-১ (বরেন্দ্র অঞ্চলে)
- পানি সাশ্রয়ী শস্য বিন্যাস-২ (মাগুরা)
- লবণাক্ত এলাকায় সূর্যমুখী, ভূট্টা ও সয়াবীন চাষে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা
- লবণাক্ত এলাকায় রবিশস্য চাষের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে পুকুর ও জমির অনুপাত
- লবণাক্ত এলাকায় গম চাষে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা
- বরেন্দ্র অঞ্চলে রবি ও খরিফ শস্যের জন্য সেচ এবং মাটির আর্দ্রতা ব্যবস্থাপনা
- ধান চাষে স্বল্প পানি
- সেচ নালা প্রযুক্তি
- পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকার জন্য নূতন শস্য পরিক্রমা
- আর্সেনিকমুক্ত পানি উত্তোলনের জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন
- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লবণাক্ত এলাকার নতুন শস্য পরিক্রমা
- বিনাশাইল ধান চাষে পরিপূরক সেচ
- ধানের জমিতে নাইট্রেট লিচিং (চুয়ানো)
- ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থা
- ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর পরিমাপের যন্ত্র উদ্ভাবন
- ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ
- ধানগাছ কর্তৃক আর্সেনিক শোষণ এবং মাটি-উদ্ভিদে আর্সেনিকের স্থানান্তর
- জলবায়ুর পরিবর্তন
- পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা
- সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় টমেটোর ঢলে পড়া রোগ দমন
- আমন মৌসুমে স্থানীয় জাত চাষের কারণ
- উন্নত আমন ধান চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সফলতা নির্ণায়ক উপাদান
- কতিপয় ফসলের রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা
- রোগ-প্রতিরোধী শস্যজাত উদ্ভাবন ও বিস্তার
- মাটির স্বাস্থ্য সেবা

- গৃহাঙ্গনে ফলজ উদ্যানের মডেল
- বিনাশাইল ধানচাষের উপকারিতা
- ফসল উৎপাদনে পয়োনিষ্কাশিত আবর্জনার ব্যবহার
- নাইট্রোজেন সার হ্রাসে ইউরিয়ার সুপার গ্র্যানিউল
- ধান-ধান শস্য পরিক্রমায় জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সার সাশ্রয়
- অঞ্চলভিত্তিক লাভজনক শস্য বিন্যাস
- ধান সংরক্ষণে পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা
- মাল্টার কলম করার কলাকৌশল
- সফেদার বংশবিস্তার কলাকৌশল
- পেয়ারার সাদা মাছি দমন ব্যবস্থাপনা
- সরিষা, বোরো, রোপা আমন শস্য বিন্যাসে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে জৈব ও অজৈব সারের ব্যবস্থাপনা
- লবণাক্ত এলাকায় ফারো রিজ রোপন পদ্ধতি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসমূহ

- কৃষি গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৩৮৬ (১৯৭৯-৮০) সালের কৃষি উন্নয়নে "রাষ্ট্রপতি পুরস্কার" লাভ।
- কৃষি গবেষণা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দু'জন বিজ্ঞানী জনাব লুৎফুর রহমান ও ড. মো: আনোয়ারুল কাদের শেখ কর্তৃক ১৩৮৭ (১৯৮০-৮১) ও ১৩৮৮ (১৯৮১-৮২) সালের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ।
- কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. মো: আনোয়ারুল কাদের শেখ কর্তৃক বাংলাদেশ মহিলা বিজ্ঞানী সমিতি হতে ১৯৮৩ সালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সনদ ও স্বর্ণপদক লাভ।
- উন্নত ধানের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. এ. জে. মিয়া কর্তৃক ১৩৯৩ (১৯৮৬-৮৭) সালের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ।
- উন্নত ধানের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চারজন বিজ্ঞানী সর্বজনাব ড. এ. জে. মিয়া, ড. মো: আলী আযম, লোকমান হাকিম এবং এম. এ. মনসুর কর্তৃক ১৯৮৯ সালে বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুবুল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট হতে পুরস্কার লাভ।
- কৃষি গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিস্বরূপ বিনা কর্তৃক ২০০৩ সালে ICRISAT এবং NARS হতে ক্রেস্ট ও সনদ লাভ।
- উন্নত ছোলার জাত উদ্ভাবনের জন্য ড. কে. এম. শামসুজ্জামান কর্তৃক ২০০৩ সালে ICRISAT এবং NARS হতে ক্রেস্ট এবং সনদ লাভ।
- ফিলিপাইন ফসল বিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক ২০০৪ সালে ৩৫তম বার্ষিক গবেষণা কনফারেন্সে ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এর "শ্রেষ্ঠ পোস্টার" পুরস্কার অর্জন।
- ডাল গবেষণা ও জাত উন্নয়নে অবদানের জন্য ড. কে. এম. শামসুজ্জামান কর্তৃক ২০০৭ সালে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে ক্রেস্ট ও সনদ লাভ।
- কৃষি গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভাগীয় প্রধান ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম এর নেতৃত্বে বায়োটেকনোলজি বিভাগ, বিনা কর্তৃক ২০১৩ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৮ (রৌপ্য পদক) লাভ।
- ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় প্রধান, বায়োটেকনোলজি বিভাগ এর ধানের জাত উদ্ভাবনে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার কর্তৃক ২০১৪ সালে "সুপ্রিম সিড স্বর্ণপদক" অর্জন।
- ফসলের জাত উদ্ভাবনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পিএসও এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগ এর প্রধান, ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম কর্তৃক ২০১৪ সালে বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি

কর্তৃক "Best Young Scientist-2012" পুরস্কার লাভ।

- কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড হতে ''মার্কেন্টাইল লিমিটেড সম্মাননা পদক-২০১৪'' পদক লাভ।
- ফুড সিকিউরিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পিএসও এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগ এর প্রধান, ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম কর্তৃক ২০১৪ সালে জাতিসংঘের FAO-IAEA হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ''Outstanding Achievement Award'' লাভ।
- কৃষি গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৪ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯" স্বর্ণ পদক লাভ।
- ড. মো. আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার উদ্ভিদ প্রজনন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি কর্তৃক "Young Scientist-2015'' পুরস্কার লাভ।
- ড. মো. হারুন-অর রশিদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বায়োটেকনোলজি বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে জীবাণু সার তৈরীর উপযোগী তিনটি নতুন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া *[Rhizobium lentis (R), R. binae (R). R. bangladeshense (R)]* আবিষ্কার করা হয়েছে, যাদের প্রজাতি অংশে মসুর বিনা ও বাংলাদেশের নাম যুক্ত আছে।
- কৃষি গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৬ সালে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক হতে IDB Prize, 2016 for Science and Technology লাভ (পদক ও ৪০ হাজার ডলার)।
- কৃষি গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ''জাতীয় পরিবেশ পদক-২০১৬'' স্বর্ণ পদক লাভ।
- ড. মো. হারুন অর রশিদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বায়োটেকনোলজি বিভাগ এর কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কৃষিবিদ ইস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) কর্তৃক ২০১৬ সালে "বর্ষসেরা কৃষিবিদ" স্বর্ণপদক অর্জন।
- ড. মো. আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এর কৃষি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (BAAG) কর্তৃক ২০১৮ সালে সুপ্রিম সিড স্বর্নপদক অর্জন।
- লবণ ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) কর্তৃক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগকে ২০১৮ সনে ক্রেস্ট প্রদান।

অন্যান্য স্বীকৃতিসমূহ

- চতুর্দশ বার্ষিক বিজ্ঞান সম্মেলনে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনার জন্য শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী (অনুর্ধ ৩৫) হিসেবে ড. এম. এ. সাত্তার নির্বাচিত ও ১৯৮৯ সালের বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির পুরস্কার BAAS Award (ক্রেষ্ট ও সনদ) লাভ।
- উনবিংশতম বার্ষিক বিজ্ঞান সম্মেলনে শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনার স্বীকৃতি স্বরূপ মো. ইকরাম উল হক কর্তৃক ১৯৯৮ সালের বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির পুরস্কার লাভ।
- কৃষি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখায় ড. এম. এ. ছালাম কর্তৃক ২০০০ সালে "BAED" হতে বাংলাদেশ পরিবেশ উন্নয়ন পুরস্কার লাভ।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক ফাউন্ডেশন কোর্সে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০০০ সালে ড. মো: তারিকুল ইসলামের Chairman's Award লাভ।
- ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (IEB) জার্নালে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় ড. মো. আজগার আলী সরকার কর্তৃক ২০০০ সালে IEB হতে পুরস্কার লাভ।

এক নজরে
বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তি (কমোডিটি)

সারণী-১: পরমাণু শক্তি ও অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত মাঠ ও উদ্যান ফসলের ১১২টি জাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
ধান (২৪)	ইরাটম-২৪	বোরো ও আউশ	১৪০-১৪৫/ ১২৫-১৩৫	বোরো- ৬.৫ আউশ- ৩.৫	মধ্যম আগাম, উচ্চ ফলনশীল, চাল লম্বা ও মাঝারি মোটা।
	ইরাটম-৩৮	বোরো ও আউশ	১২০-১২৫ ১০০-১১০	৫.০ ৩.০	গাছ খাটো, আগাম পাকে, চাল চিকন ও মাঝারি মোটা।
	বিনাশাইল	আমন	১৩৫-১৪০	৪.২	বন্যা পরবর্তি পূনর্বাসনের জন্য উপযোগী, কম সেচ ও সার লাগে, চাল চিকন ও সরু (নাইজারশাইলের মত)।
	বিনাধান-৪	আমন	১৩০-১৩৫	৫.০	উচ্চ ফলনশীল, চাল মাঝারি চিকন।
	বিনাধান-৫	বোরো	১৪০-১৫০	৭.০	উচ্চ ফলনশীল, চাল মাঝারি চিকন।
	বিনাধান-৬	বোরো	১৫০-১৬০	৭.৫	সর্বোচ্চ ফলনশীল, চাল মোটা।
	বিনাধান-৭	আমন	১১৫-১২০	৪.৮	গাছ হেলে পড়েনা, চাল লম্বা ও চিকন। ধান কাটার পরে সহজেই গম, আলু, সরিষা ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন কম হয়।
	বিনাধান-৮	বোরো	১৪০-১৪৫	বোরো -৫.০ (লবণাক্ত জমিতে)- ৭.০ স্বাভাবিক জমিতে)	লবণ সহিষ্ণু (ইসি ৮-১০ ডিএস/মি), গাছ মধ্যম খাটো, চাল মোটা।
	বিনাধান-৯	আমন	১২০-১২৫	৩.৭৫	গাছ হেলে পড়েনা, চাল লম্বা ও চিকন, বিদেশে রপ্তানী উপযোগী। ধান কাটার পরে সহজেই গম, আলু, সরিষা ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়।
	বিনাধান-১০	বোরো	১৩০-১৩৫	৫.৫ (লবণাক্ত জমিতে) ৮.৫ (স্বাভাবিক জমিতে)	লবণ সহিষ্ণু (ইসি ১০-১২ ডিএস/মি), গাছ মধ্যম খাটো, চাল লম্বা ও মাঝারী।
	বিনাধান-১১	আমন	১১০-১১৫	৪.০ -৪.৫ (জলমগ্ন অবস্থায়), ৫.৭-৬.০ (স্বাভাবিক জমিতে)	চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে। আগাম পাকে। চাল চিকন।
	বিনাধান-১২	আমন	১২৫-১৩০	৪.০ (জলমগ্ন অবস্থায়) ৪.৫ (স্বাভাবিক অবস্থায়)	চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে। চাল মিনিকেটের মতো।
	বিনাধান-১৩	আমন	১৩৮-১৪২	৩.৬	সুগন্ধি জাত, গাছ হেলে পড়েনা, ধান কাল উজ্জ্বল বর্ণের, খাট ও মোটা।
	বিনাধান-১৪	বোরো	১২০-১৩০	৬.৮৫	নাবি বোরো (ব্রাউশ ধান) লম্বা জীবনকাল সম্পন্ন সরিষা মসুর, খেসারী, শাক সব্জি ও আগাম গম কাটার পরে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহ হতে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে রোপণ করলেও মে মাসের ২য় সপ্তাহ হতে ৪র্থ সপ্তাহে কাটা যায়। গাছ খাটো, হেলে পড়েনা, চাল লম্বা ও চিকন। ২০% সেচের পানি সাশ্রয়ী। চালে ১০% আমিষ থাকে।
	বিনাধান-১৫	আমন	১১৫-১২০	৫.৮	বিদেশে রপ্তানিযোগ্য ও উচ্চফলশীল আগাম জাত। চাল লম্বা ও চিকন।
	বিনাধান-১৬	আমন	১০০-১০৫	৫.৫	চাল লম্বা ও চিকন। এ জাতের ধান কাটার পরে সহজেই গম, আলু, সরিষা ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়।

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
	বিনাধান-১৭	আমন	১১০-১১৫	৬.৫	চাল লম্বা ও চিকন। এ জাতের ধান কাটার পরে সহজেই গম, আলু, সরিষা ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়। সার ও পানি সাশ্রয়ী জাত।
	বিনাধান-১৮	বোরো	১৪৮-১৫৩	৭.২৫	ব্রিধান-২৯ এর চেয়ে ১৩-১৫ দিন আগে পাকে কিন্তু ফলন প্রায় সমান। চাল লম্বা ও মাঝারী মোটা। চাল হাল্কা সুগন্ধিযুক্ত। ব্রিধান-২৯ এর তুলনায় আগাম হওয়ায় উৎপাদন খরচ কম ও লাভ বেশি।
	বিনাধান-১৯	আউশ ও আমন	৯৫-১০০	আউশ-৪.০ আমন-৫.০	খরা সহিষ্ণু, বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায় সরাসরি সারিতে বপন (ডিবলিং) রোপন করা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় সেচের প্রয়োজন পড়ে না তবে প্রচন্ড খরার সময় ১-২টি সেচ লাগে, ধান ও চাল চিকন ও লম্বা।
	বিনাধান-২০	আমন	১২৫-১৩০	৪.৫	জিংক সমৃদ্ধ ধান, আকাড়া চালে ২৭.৫ পিপিএম জিঙ্ক ও ২০-৩১ পিপিএম আয়রণ থাকে, বাদামী গাছ ফড়িং এর প্রতি মধ্যম মাত্রায় প্রতিরোধী, চালের রং লালচে লম্বা ও চিকন।
	বিনাধান-২১	আউশ	১০০-১০৫	৪.৫	খরা সহিষ্ণু, চাল চিকন ও লম্বা।
	বিনাধান-২২	আমন	১১২-১১৫	৫.৫	উচ্চ ফলনশীল, চাল চিকন ও লম্বা।
	বিনাধান-২৩	আমন	১১৫-১২৫	৫.৩-৫.৮	আলোক অসংবেদনশীল, দেশের জোয়ারভাটা, লবণাক্ততা ও বন্যা কবলিত এলাকার জন্য উপযোগী। পরিপক্ক অবস্থায় জাতটি ৮ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা ও ১৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে।
	বিনাধান-২৪	বোরো	১৪৩-১৪৫	৬.৫	উচ্চফলনশীল, আলোক অসংবেদনশীল এবং লম্বা ও মাঝারী চিকন দানা বিশিষ্ট, গাছ শক্ত বলে হেলে পড়ে না।
গম (০১)	বিনাগম-১	রবি	১০৫-১১০	লবণাক্ত মাটিতে ২.৮ ও অলবণাক্ত মাটিতে ৩.৮	অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায় হতে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১০-১২ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে, দানা মাঝারী আকারের ও লালচে রংয়ের।
চীনাবাদাম (১০)	বিনাচীনাবাদাম -১	রবি ও খরিফ	১৫০-১৬০/ ১২৫-১৩৫	২.৮ ২.০	বাদাম ও দানা আকারে বড়, রোগ বালাই সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন।
	বিনাচীনাবাদাম -২	রবি ও খরিফ	১৫০-১৬০/ ১২৫-১৩৫	২.৫ ২.০	বাদাম ও দানা আকারে বড়, রোগ বালাই সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন, বীজে আমিষের পরিমাণ বেশি (২৯%)।
	বিনাচীনাবাদাম -৩	রবি ও খরিফ	১৫০-১৬০/ ১২৫-১৩৫	২.৫ ২.০	বাদাম ও দানা আকারে বড়, রোগ বালাই সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন, বীজে তেলের পরিমাণ বেশী (৫২%)।
	বিনাচীনাবাদাম -৪	রবি ও খরিফ	১৪০-১৪৫/ ১০০-১২০	৩.০ ২.৫	বাদাম ও দানা আকারে মধ্যম আকারের, রোগ বালাই সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন, রবি ও খরিফ মৌসুমে প্রায় সমান ফলন দেয়, ১০০ কেজি বাদাম থেকে প্রায় ৭৫ কেজি দানা পাওয়া যায়।
	বিনাচীনাবাদাম -৫	রবি	১৪০-১৫০	২.৩	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলার লবণাক্ত মাটিতে ভাল ফলন দেয়।
	বিনাচীনাবাদাম -৬	রবি	১৪০-১৫০	২.৪	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। বাগেরহাট, খুলনা ও নোয়াখালী জেলার লবণাক্ত মাটিতে ভাল ফলন দেয়।
	বিনাচীনাবাদাম -৭	রবি	১৪০-১৫০	লবণাক্ত মাটিতে-১.৮ স্বাভাবিক মাটিতে-২.৫২	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। জাতটি জ্যাসিড ও বিছা পোকার আক্রমন সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। বাদামে শতকরা দানার হার ৬০-৭৯ ভাগ এবং বীজে শতকরা ২৮.০ ভাগ আমিষ ও ৪৮.৩ ভাগ তেল থাকে। বাদাম ছোট দানা মাঝারী আকারের।

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
	বিনাচীনাবাদাম -৮	রবি	১৪০-১৫০	লবণাক্ত মাটিতে-১.৮ স্বাভাবিক মাটিতে- ২.৫৬	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহক্ষমতা সম্পন্ন। জাতটি জ্যাসিড, পাতা মোড়ানো পোকা ও বিছা পোকার আক্রমন সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। বাদামে দানার শতকরা হার ৭৫-৭৭ ভাগ এবং বীজে শতকরা ২৮.০৫ ভাগ আমিষ ও ৪৬.৯ ভাগ তেল থাকে।
	বিনাচীনাবাদাম -৯	রবি	১৪০-১৫০	লবণাক্ত মাটিতে- ২.৯ স্বাভাবিক মাটিতে- ১.৯	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন । জাতটি জ্যাসিড, পাতা মোড়ানো পোকা ও বিছা পোকার আক্রমন সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। বাদামে দানার শতকরা হার ৭২-৮৪ ভাগ এবং বীজে শতকরা ২৩.৮ ভাগ আমিষ ও ৪৮.০ ভাগ তেল থাকে। বাদাম ও দানা মাঝারী আকারের। দানা তামাটে বর্ণের।
	বিনাচীনাবাদাম -১০	রবি ও খরিফ	১২৫-১৩০ ১১০-১২০	২.৮ ২.২	প্রতি গাছে ২২-৩২টি বাদাম ধরে। বাদাম মধ্যম আকারের। দানার রং তামাটে লাল ও দানা মাঝারি। সেলিং হার ৭২-৭৫%, বীজে আমিষ ২৮.১০% ও তেলের পরিমাণ ৫০.৬% ।
সরিষা (১০)	সফল	রবি	৯০-৯৫	১.৭	গাছ লম্বা, কান্ড শক্ত, রোগ প্রতিরোধী।
	অগ্রণী	রবি	৮৫-৯০	১.৭৫	গাছ লম্বা, কান্ড শক্ত, রোগ প্রতিরোধী।
	বিনাসরিষা-৩	রবি	৮৫-৯০	১.৯	বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪৪%, গাছ খাটো, অল্টারনেরিয়া রোগ সহনশীল।
	বিনাসরিষা-৪	রবি	৮৫-৮৭	১.৯	বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪৪%, গাছ খাটো।
	বিনাসরিষা-৫	রবি	৮৫-৯০	১.৬	লবণ সহিষ্ণু জাত, গাছ খাট।
	বিনাসরিষা-৬	রবি	৯০-৯৫	১.৫	লবণ সহিষ্ণু জাত, গাছ লম্বা।
	বিনাসরিষা-৭	রবি	১০২-১১০	২.০	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৬-৩৮%, গাছ লম্বা।
	বিনাসরিষা-৮	রবি	১০০-১০৮	১.৭	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৬-৩৮%, গাছ লম্বা।
	বিনাসরিষা-৯	রবি	৭৫-৮০	১.৮	গাছ খাট, অল্টারনেরিয়া রোগ সহনশীল ।
	বিনাসরিষা-১০	রবি	৭৫-৮০	১.৭	জাতটি খাটো এবং টরি টাইপের। উচ্চ ফলনশীল।
খেসারি (১)	বিনাখেসারী-১	রবি	১১০-১১৫	১.৯	উচ্চ ফলনশীল। BOAA কম। পাতার রঙ গাঢ় সবুজ।
মাষকলাই (১)	বিনামাষ-১	খরিফ-২	৮০-৮৫	১.০	সার্কোস্পোরা লিফস্পট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহণশীল, নাবি রোপণ উপযোগী।
সয়াবিন (৬)	বিনাসয়াবিন-১	রবি ও খরিফ	১১০-১১৫ ৯৫-১০০	রবিঃ ২.৫ খরিফ-২ঃ ২.৭	হলুদ মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী জাত। পাতা গাঢ় সবুজ এবং বীজের রং হালকা হলুদ।
	বিনাসয়াবিন-২	রবি ও খরিফ	১০৮-১১২ ১১৫-১২০	রবিঃ ২.৬ খরিফ-২ঃ ২.৯	হলুদ মোজাইক ভাইরাস সহনশীল। পাতা গাঢ় সবুজ এবং বীজের রং হালকা হলুদ।
	বিনাসয়াবিন-৩	রবি ও খরিফ	১১০-১২০ ১১০-১১০	রবিঃ ২.৬ খরিফ-২ঃ ২.৯	হাইলাম ছোট এবং কালো, বীজের রঙ ক্রীম বর্ণের। হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ প্রতিরোধে সক্ষম।
	বিনাসয়াবিন-৪	রবি ও খরিফ	১১০-১২৫ ১০৫-১১৫	রবিঃ ২.৭ খরিফ-২ঃ ২.৯	হলুদ মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী। পাতা সবুজ, হাইলাম ছোট এবং কালো, বীজের রং ক্রীম বর্ণের।
	বিনাসয়াবিন-৫	রবি ও খরিফ	১০৫-১১৫ ১০০-১০৫	রবিঃ ২.৫ খরিফ-২ঃ ২.৭	হলুদ মোজাইক ভাইরাস সহনশীল জাত। গাছের উচ্চতা মাঝারি লম্বা, বীজের রং হলদে ও উজ্জ্বল।
	বিনাসয়াবিন-৬	রবি ও খরিফ	১০২-১১৫	২.৬০	পাতা গাঢ় সবুজ এবং বীজের রং হালকা হলুদ। ভাইরাসজনিত হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
তিল (৪)	বিনাতিল-১	খরিফ-১	৮৫-৯০	১.৩	বীজে তেলের পরিমাণ ৫২%, কান্ড পঁচা রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন, বীজ ক্রিম রংয়ের।
	বিনাতিল-২	খরিফ-১	৯১-৯৮	১.৪	খরা সহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ ৪০%, কান্ড পঁচা রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন, শাখা প্রশাখাযুক্ত।
	বিনাতিল-৩	খরিফ-১	৮৫-৯০	১.৫	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%,-গোড়া পঁচা রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন।
	বিনাতিল-৪	খরিফ-১	৮০-৮৫	১.৭	গাছ শাখা বিশিষ্ট। বীজাবরণ ধূসর কালো রঙের।
পাট (৩)	এটমপাট-৩৮	খরিফ-১	১৩০-১৩৫	২.৮	স্টিপিউল উপপত্রে রুপান্তরিত হয়েছে। জাতের বিশুদ্ধতা সহজেই রক্ষা করা যায়।
	বিনাদেশী পাট-২	খরিফ-১	১৩০-১৩৫	৩.৫	আগাম বপন উপযোগী, আঁশের গুণাগুণ ভাল।
	বিনাপাটশাক-১	খরিফ-১	২৫-৩০		কোন আঁশ পাওয়া যায়না। অন্যান্য জাতের চেয়ে শাক পাতার ফলন ২৫-৩০% বেশি।
মুগ (১০)	বিনামুগ-১	আগাম রবি	৮৫-৯০	০.৯	সোনামুগ, সার্কোস্পোরা লিফস্পটসহ অন্যান্য রোগ সহণশীল।
	বিনামুগ-২	খরিফ-১	৭০-৮০	১.৪	সার্কোস্পোরা লিফস্পট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহণশীল।
	বিনামুগ-৩	রবি	৮০-৮৫	১.০	আগাম পাকে, গাছ খাট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহণশীল।
	বিনামুগ-৪	রবি	৭৫-৮০	১.১	আগাম পাকে, গাছ খাট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহণশীল।
	বিনামুগ-৫	খরিফ-১	৭০-৮০	১.৫	হলুদ মোজাইক রোগ সহণশীল।
	বিনামুগ-৬	খরিফ-১	৬৪-৬৮	১.৫	গাছ মাঝারি উচ্চতার, আগাম পাকে, ফল ও বীজ আকারে বড়, রোগ সহণশীল। পডের আকার বড়।
	বিনামুগ-৭	খরিফ-১	৭৪-৭৮	১.৮	হলুদ মোজাইক রোগ সহণশীল ও সার্কোস্পোরা রোগ প্রতিরোধী, প্রায় ৮০% পড একসাথে পাকে।
	বিনামুগ-৮	খরিফ-১	৬৪-৬৭	১.৮	প্রায় ৮০% পড একসাথে পাকে। বীজ উজ্জ্বল বর্ণের।
	বিনামুগ-৯	খরিফ-১	৬০-৬৪	১.৮	হলুদ মোজাইক রোগ সহণশীল, প্রায় ৮০% পড একসাথে পাকে।
	বিনামুগ-১০	খরিফ-১	৬৩-৬৫	১.৮	হলুদ মোজাইক ভাইরাস এবং সার্কোস্পোরা রোগ সহনশীল।
মসুর (১১)	বিনামসুর-১	রবি	১৩০-১৩৫	১.৮	পডের আবরণ কালো, রাস্ট রোগ প্রতিরোধী, ডালের রং গাঢ় লাল।
	বিনামসুর-২	রবি	৯৮-১০০	২.০	বীজে আমিষের পরিমাণ ২৫.৯%।
	বিনামসুর-৩	রবি	৯৫-১০০	২.৪	রোগবালাই সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন জাত।
	বিনামসুর-৪	রবি	৯৬-১০২	১.৮	মরিচা, গোড়া ও শিকড় পঁচা/উইল্ট রোগের প্রতি মধ্যম মাত্রায় সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন, বরেন্দ্র এলাকায় চাষ করা যায়।
	বিনামসুর-৫	রবি	৯৫-১০৪	২.২	স্টেমফাইলাম ও গোড়া পঁচা রোগ এবং খরা সহণশীল।
	বিনামসুর-৬	রবি	১০৫-১১০	২.০	মরিচা, স্টেমফাইলাম ও গোড়া পঁচা রোগ এবং খরা সহণশীল।
	বিনামসুর-৭	রবি	১০৮-১১০	২.০	গাছ খাড়া, রোগ সহণশীল।
	বিনামসুর-৮	রবি	৯৫-১০০	২.৫	গাছ খাড়া এবং অধিক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, ফুল গোলাপী বর্ণের, আগাম পাকে।
	বিনামসুর-৯	রবি	৯৯-১০৪	২.৪	কান্ড হালকা সবুজ এবং পাতাগুলো গাঢ় সবুজ, ফুল সাদা বর্ণের, আগাম পাকে।

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
	বিনামসুর-১০	রবি	১০৮-১১০	খরা অবস্থায়-১.৫ ও স্বাভাবিক অবস্থায়- ২.২	খরা সহিষ্ণু। বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ৩১-৩২% ও ডালের পরিমাণ-৮৮%।
	বিনামসুর-১১	রবি	১০৮-১১২	খরা অবস্থায়-২.০ ও স্বাভাবিক অবস্থায়- ২.৫	খরা সহিষ্ণু। বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ৩২-৩৩% ও ডালের পরিমাণ-৮৯%।
ছোলা (১০)	হাইপ্রোছোলা	রবি	১২০-১২৫	১.৪	অধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ।
	বিনাছোলা-২	রবি	১২০-১৩০	১.৫	বড় দানা।
	বিনাছোলা-৩	রবি	১১৫-১২০	১.৬	বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ সহণশীল।
	বিনাছোলা-৪	রবি	১২০-১২৫	১.৬	বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ সহণশীল।
	বিনাছোলা-৫	রবি	১২০-১২৫	১.৫২	দানা মাঝারি আকারের।
	বিনাছোলা-৬	রবি	১২০-১২৫	১.৬৯	উজ্জ্বল বর্ণের বীজ, ফলন ১.৬৯ টন/হে., দানা মাঝারি আকারের।
	বিনাছোলা-৭	রবি	১২০-১২৫	১.৭	দানা মাঝারি আকারের।
	বিনাছোলা-৮	রবি	১২৫-১৩০	১.৮	দানা মাঝারি আকারের গোড়া পঁচা ও বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ সহণশীল।
	বিনাছোলা-৯	রবি	১২৫-১৩০	১.৯	দানা বড় ও ঘিয়া রংয়ের।
	বিনাছোলা-১০	রবি	১১৫-১২২	১.৮	দানা বড় ও খড় রংয়ের।
টমেটো (১৩)	বাহার	শীতকালীন	৯০-১০০	৬৫	বড় ফল ও সুস্বাদু।
	বিনাটমেটো-২	গ্রীষ্মকালীন	৬০	৩৮	ফল গোলাকার, ফল ধরার জন্য হরমোন প্রয়োগ করতে হয় না।
	বিনাটমেটো-৩	গ্রীষ্মকালীন	৬৫-৭৫	৪০	বড় ফল, প্রায় গোলাকার, ফল ধরার জন্য হরমোন প্রয়োগ করতে হয়না।
	বিনাটমেটো-৪	রবি	৯৫-১০০	৮২	ফল গোলাকার, ভিটামিন সি এর পরিমাণ বেশি।
	বিনাটমেটো-৫	রবি	৯০-৯৫	৬৯	ফল লম্বাটে, ভিটামিন সি এর পরিমাণ বেশি।
	বিনাটমেটো-৯	শীতকালীন	৮৫-৯০	১০৫	উচ্চ ফলনশীল। ফলের আকৃতি গোলাকার এবং মসৃণ।
	বিনাটমেটো-১০	শীতকালীন	৮০-৮৫	১১১	চেরি টমেটো।
	বিনাটমেটো-১১	শীতকালীন	৭০-৭৫	৯০-৯৫	ফল ডিম্বাকারের ও প্রতিটি ফলের ওজন ৯০-১০০ গ্রাম, ফল সংরক্ষণকাল-২০-২২ দিন।
	বিনাটমেটো-১২	শীতকালীন	৭০-৮০	৯০-৯৫	ফল গোলাকার ও প্রতিটি ফলের ওজন-৮০-৯০ গ্রাম, ফল সংরক্ষণকাল-২০-২৫ দিন।
	বিনাটমেটো-১৩	শীতকালীন	১২০-১২৫	৮৭	ফলের আকার গোলাকার এবং বোটার বিপরীত দিকে সামান্য সূচালো। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম।
লেবু (০২)	বিনালেবু-১	সারা বছর		২৪-৩৫	সারা বছর ফলন দেয়। ফল ডিম্বাকার, ফলের অগ্রভাগ সূচাঁলো ও সুগন্ধিযুক্ত। প্রতিটি ফলের ওজন ৯০-১৫০ গ্রাম।
	বিনালেবু-২	সারা বছর	৩৫-৫০	বহুবর্ষজীবী	সারা বছর ফল দেয়, ফল ডিম্বাকৃতি থেকে সিলিন্ডাকৃতির ফলের অগ্রভাগ সূচাঁলো বহিরাবরণ মাঝারি মসৃণ এবং লেবু সুগন্ধিযুক্ত পরিপক্ক অবস্থায় কিছু ফলের ৩-৪ টা বীজ থাকে কিন্তু অধিকাংশই বীজ শূন্য।
রসুন (০১)	বিনারসুন-১	রবি	১৩৫-১৪০	১৩-১৫	প্রতিটি কন্দের গড় ওজন ২৬ গ্রাম কোয়ার সংখ্যা ২৪-৩০টি।
মরিচ (০২)	বিনামরিচ-১	রবি	১৩৫-১৪০	৩৪-৩৮	প্রতি গাছে ২০-২৫টি মরিচ ধরে, ৬০-৬৫ দিনে মরিচ তোলার উপযোগী হয়, ৮-৯ বার মরিচ তোলা যায়, তুলনামূলকভাবে কম ঝালযুক্ত, মসলা, সালাদ এমনকি সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
	বিনামরিচ-২	রবি		২৯.১০	গাছ লম্বা, ঝোঁপালো এবং অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট প্রতি গাছে ১৪-১৮ টি ঝোঁপালো শাখা-প্রশাখা থাকে প্রতি গাছে ৭০০-৭৫০ গ্রাম পর্যন্ত মরিচ হয়। প্রতিটি মরিচের গড় ওজন ৭-১২ গ্রাম ওজন হয়।
পিঁয়াজ (০২)	বিনাপিঁয়াজ-১	খরিফ-১	১৮০-১৯০	কন্দ- ৮.২ বীজ-০.৬৩	একবর্ষজীবী, খরিফ-১ মৌসুমের উপযোগী গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজের জাত। বীজ থেকে বীজ উৎপাদনের জন্য ১৮০-১৯০ দিন এবং কন্দ উৎপাদনের জন্য ১১০-১২০ দিন সময় লাগে। স্বাভাবিক অবস্থায় এর কন্দ ২ মাস বা তার বেশি সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। প্রতিটি গাছে পাতার সংখ্যা ৮-১০ টি। প্রতিটি শল্ককন্দের (বাল্ব) ওজন ১৫-২০ গ্রাম। গাছের উচ্চতা ৩৯-৪২ সেমি। কন্দের রং লালচে, অনেকটা চ্যাপ্টা, গলা চিকন। ১০০০ বীজের ওজন ৩.৫৬ গ্রাম।
	বিনাপিঁয়াজ-২	খরিফ-২	২১০-২১৫	কন্দ-৮.৭ বীজ-০.৭	একবর্ষজীবী, খরিফ-১ মৌসুমের উপযোগী গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজের জাত। বীজ থেকে বীজ উৎপাদনের জন্য ১৮০-১৯০ দিন এবং কন্দ উৎপাদনের জন্য ১১৫-১২০ দিন সময় লাগে। স্বাভাবিক অবস্থায় এর কন্দ ২ মাস বা তার বেশি সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। প্রতিটি গাছে পাতার সংখ্যা ৫-৬ টি। প্রতিটি শল্ককন্দের (বাল্ব) ওজন ১৫-২০ গ্রাম। গাছের উচ্চতা ৩৮-৪২ সেমি। কন্দ লালচে বর্ণের গোলাকার ও গলা লম্বাটে। ১০০০ বীজের ওজন ৩.৩৯ গ্রাম।
হলুদ (০১)	বিনাহলুদ-১	সারা বছর	৩৩০	৩০-৩৩	গাছ লম্বা আকৃতির, পাতা গাঢ় সবুজ এবং লম্বা। প্রতি গাছে হলুদের গড় ওজন ৮৫০-১০০০ গ্রাম।

সারণী-২: ফসলের উন্নত জাত ছাড়াও নাইট্রোজেন সারের বিকল্প হিসাবে ৯টি শিম জাতীয় ফসলের জন্য ৯টি জীবাণুসার উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা ক্ষেত্রবিশেষে ১৫-২০০ শতাংশ পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি করে।

ক্রমিক নং	জীবাণুসারের নাম	যে ফসলে কার্যকরী	জীবাণুসার প্রয়োগ না করার তুলনায় জীবাণুসার প্রয়োগ করায় ফলন বৃদ্ধির হার (%)
১.	বিনা এলটি-১৮	মসুর	১৫-৪০
২.	বিনা সিপি-২	ছোলা	২৫-৩০
৩.	বিনা এমবি-১	মুগ	১৮-৩০
৪.	বিনা সিওপি-৭	বরবটি	২৫-৪৫
৫.	বিনা জিএন-২	চীনাবাদাম	২০-৪০
৬.	বিনা এসবি-৪	সয়াবিন	৭৫-১০০
৭.	বিনা বিজি-১	মাষ কলাই	২০-৩০
৮.	বিনা ডিসি-৯	ধইঞ্চা	২৫-৫০
৯.	বিনা জীবাণু সার-১০	ফেলন	১৪-২৪

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর খামার পরিদর্শনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক

বিনা উপকেন্দ্র নালিতাবাড়ীতে বিনাধান-১১ এর ফসল কর্তন ও মাঠদিবস অনুষ্ঠানে বিনা'র মহাপরিচালক

ধান

বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে যে সকল ফসল আবাদ করা হচ্ছে, তার মধ্যে ধান অন্যতম। চার হাজার বৎসর বা তারও পূর্ব থেকে দক্ষিণ চীনে ধানের চাষ হয়ে আসছে এবং চীনকে ধানের আদি উৎসভূমি হিসেবে ধরা হয়। সেখান থেকে পরে ফসলটির আবির্ভাব ঘটে প্রাচীন গন্ডোয়ানা প্রদেশে, অর্থাৎ বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলে। এখান থেকে পরে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তার লাভ করে। শ্রেণিকরণ অনুসারে ধান ঘাস (Gramineae) পরিবারের অধীন। আবার ধানের অনেকগুলো উপপ্রজাতিও রয়েছে। যেমন অরাইজা স্যাটাইভা (*Oryza sativa* L.) এবং অরাইজা গ্ল্যাবেরিমা (*Oryza glaberrima* L.)। অরাইজা স্যাটাইভার তিনটি ইকোটাইপ রয়েছে যথা- ইন্ডিকা, জ্যাপোনিকা ও জ্যাভোনিকা। সার্কভুক্ত দেশগুলিতে ইন্ডিকা ইকোটাইপ ব্যাপকভাবে আবাদ করা হয়। পক্ষান্তরে, অন্য দু'টি ইকোটাইপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে আবাদ করা হয়। অরাইজা গ্ল্যাবেরিমা আফ্রিকা মহাদেশে আবাদ করা হয়। ধান পৃথিবীর ২০% লোকের প্রধান খাদ্য। একমাত্র এশিয়া মহাদেশেই ২০০ কোটির ওপর মানুষ তাদের মোট ক্যালরির ৬০-৭০% পেয়ে থাকে ধান বা ধানজাত খাদ্য থেকে। ধান উৎপাদনের দিক থেকে এশিয়ায় বাংলাদেশের স্থান চতুর্থ। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) থেকে এ পর্যন্ত ২৪টি উন্নত ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন প্রযুক্তি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

বিনাশাইল

দেশী ধানের জাত নাইজারশাইলের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাত রোপা আমন হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ১৯৮৭ সালে অনুমোদিত হয়।

মাঠে বিনাশাইল ধান

বিনাশাইল ধানের বীজ

মাতৃজাত নাইজারশাইলের তুলনায় ২০% বেশি ফলন দেয়। জাতটির জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন এবং গড় ফলন ৪.০ টন/হেক্টর। স্বল্প পরিমাণ সার এবং সেচের প্রয়োজন, এমনকি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল হয়েও বিনাশাইল জাতটি চাষ করা যেতে পারে। আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ (সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ) পর্যন্ত চারা রোপণ করে ভাল ফলন পাওয়া যায় বলে বন্যার পর নাবি রোপার জন্য জাতটি খুবই উপযুক্ত। এ জাতে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ খুবই কম হয়। নাবিতে রোপণে হেক্টর প্রতি ফলন ৩.২-৩.৫ টন। চাউল খুবই সুস্বাদু ও অধিক প্রোটিন যুক্ত (৮.৫%)। ৪০ কেজি ধান হতে প্রায় ৩১ কেজি চাল হয়।

বিশেষ গুণ

দ্বি-ফসল বা ত্রি-ফসলি জমিতে খরিফ-১ এর ফসল যেমন- আউশ ধান, পাট ইত্যাদি সংগ্রহ করে পরবর্তী আমন চাষে বিলম্ব হয়। তখন উচ্চ ফলনশীল প্রচলিত জাতের ধান চাষ করা যায় না। নাবি জাতের উচ্চ ফলনশীল জাত চাষ করলে অন্যান্য ধান পাকার পরেও তা মাঠে থাকে যা পশুর আক্রমণ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। এছাড়াও কোন কোন জমি উফশী জাত চাষের উপযোগী নয়। এসব ক্ষেত্রে চাষীগণ স্থানীয় জাতের ধান চাষ করেন। এরূপ অনেক এলাকায় প্রায় শতকরা ৫০ ভাগের অধিক জমিতে স্থানীয় জাতের চাষ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিনাশাইল ধানের চাষ করলে স্থানীয় জাতের অনুরূপ উপকরণ খরচ প্রয়োজন হয় এবং অন্যান্য ধানের সাথেই পেকে যায়। তদুপরি স্থানীয় জাতের পরিবর্তে বিনাশাইলের চাষ করলে প্রায় দেড় গুণেরও অধিক ফলন ও আর্থিক লাভ বেশি পাওয়া যায়।

বিনাধান-৪

বিআর-৪ এর সাথে ইরাটম-৩৮ এর সংকরায়ণ করার পর দ্বিতীয় বৎসরে প্রাপ্ত বীজে গামা-রশ্মি প্রয়োগ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ড ১৯৯৮ সালে উন্নত রোপা আমন জাত হিসেবে বিনাধান-৪ নামে দেশব্যাপী চাষাবাদের ছাড়পত্র প্রদান করে। জাতটির জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন এবং গড় ফলন ৫.০ টন/হেক্টর।

এ জাত বিভিন্ন রোগ যথা- পাতা পোড়া, খোল পোড়া, খোল পঁচা ইত্যাদি রোগ তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিরোধ করতে পারে। মাজরা পোকা, সবুজ ঘাস ফড়িং, বাদামি গাছ ফড়িং ইত্যাদি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে এ জাতে বেশি।

মাঠে বিনাধান-৪ ইনসেটে বীজ

বিনাধান-৪ এর বীজ

বিনাধান-৫ এবং বিনাধান-৬

বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী ধানের এ জাত দু'টি পরমাণু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা জাতীয় বীজ বোর্ড ১৯৯৮ সালে উচ্চ ফলনশীল বোরো জাত হিসেবে বিনাধান-৫ ও বিনাধান-৬ নামে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

জাত দু'টির চারার উচ্চতা অন্যান্য উফশী বোরো জাতের চারা অপেক্ষা বেশি বলে শীতকালে রোপা লাগানোর সুবিধা হয়। বীজতলা আগাম করলে এবং একটু বেশি বয়স্ক (৬০-৬৫ দিনের) চারা রোপণ করলেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। জাত দু'টির জীবনকাল ও গড় ফলন যথাক্রমে ১৪০-১৫০ দিন ও ১৫০-১৬০ দিন এবং ৭.০ টন/হেক্টর ও ৭.৫ টন/হেক্টর। বিভিন্ন রোগ যথা- পাতা পোড়া, খোল পোড়া, খোল পঁচা, ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। মাজরা পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামি গাছ ফড়িং ইত্যাদি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে এ জাত দু'টিতে বেশি। দেশে উদ্ভাবিত বোরো জাত সমূহের মধ্যে বিনাধান-৬ সর্বোচ্চ ফলন প্রদানে সক্ষম।

মাঠে বিনাধান-৫ ইনসেটে বীজ

মাঠে বিনাধান-৬ ইনসেটে বীজ

সতর্কতা

জাত দু'টির গাছ লম্বা বিধায় ধান পাকার সময় ঝড়ে বা বেশি বাতাসে গাছ নুয়ে পড়তে পারে। জাত দুটি'র জীবনকাল বেশি বিধায় বিলম্বে লাগালে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সঠিক ভাবে বীজ না শুকালে এবং বীজ তলায় বীজ ফেলার পূর্বে ৩৬-৪০ ঘন্টা পানিতে না ভিজালে অংকুরোদগমে সমস্যা হতে পারে।

বিনাধান-৭

ভিয়েতনামের টিএনডিবি-১০০ জাতে ২৫০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগকৃত এম-৩ বীজ হতে বাছাই করে বিনাধান-৭ উদ্ভাবন করা হয়। ২০০৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড এ জাতটিকে উচ্চ ফলনশীল আগাম আমন জাত হিসেবে বিনাধান-৭ নামে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

এটি মাঝারি উচ্চতা বিশিষ্ট উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন আগাম পাকা জাত। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সে.মি.। পাতা গাঢ় সবুজ ও চওড়া। ছড়া ২৫ সে.মি. লম্বা ও গড়ে ১১০-১২৫ টি ধান ধরে। এর জীবনকাল ১১৫-১২০ দিন। জাতটি আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। ধান উজ্জ্বল রঙের, বেশ লম্বা ও চিকন, খেতে সুস্বাদু। ধান চিকন বলে বাজার মূল্য বেশি পাওয়া যায়। ১০০০ ধানের ওজন ২৪.৯ গ্রাম। গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৮ টন । চালে এ্যামাইলোজের পরিমান ২৪.৫%।

মাঠে বিনাধান-৭ ইনসেটে বীজ

বিশেষ গুণ

জীবনকাল কম বিধায় এ জাতটির ধান কাটার পর খুব সহজেই যে কোন রবি শস্য, গম বা আলু চাষ করা যায়। জাতটির পাতা পোড়া, খোল পঁচা ও কান্ড পঁচা রোগ ইত্যাদি প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি। এছাড়া এটি প্রায় সব ধরনের পোকামাকড়ের আক্রমণ ভালভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। বিশেষ করে এটির বাদামি গাছ ফড়িং ও পামরি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। জাতটি আগাম পাকে বলে দেশের উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

বিনাধান-৮

মধ্যম খাটো ও লবণ অসহিষ্ণু আধুনিক ধানের জাত IR29 এর সাথে ভারতীয় লবণ সহিষ্ণু POKKALI ধান জাতের সংকরায়ণ করে পরবর্তীতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লবণাক্ত সহিষ্ণু উন্নত কৌলিক সারি IR66946-3R-149-1-1 (PBRC(STL)-20) সনাক্ত করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবণাক্ত জমি ও লবণমুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন ও অন্যান্য গুণাবলী পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় লবণ সহিষ্ণু জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। লবণ সহিষ্ণু উন্নত জাত হিসাবে বানিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য সারিটিকে বিনাধান-৮ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১০ সালে অনুমোদন দেয়া হয়। বিনাধান-৮ একটি উচ্চ ফলনশীল ও ভাল গুনাগুন সম্পন্ন আলোক অসংবেদনশীল বোরো ধানের জাত। এটি কুশি অবস্থা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮-১০ ডিএস/মি এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল।

এ জাতের ডিগপাতা খাড়া এবং লম্বা। পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা এবং কান্ড সবুজ থাকে। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সে.মি.। এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৬.৭ গ্রাম। আগাম পাকে, ধান উজ্জ্বল, শক্ত এবং চাল মাঝারী মোটা। বিনাধান-৮ বিভিন্ন রোগ যেমন পাতাপোড়া, খোল পোড়া, কান্ড পঁচা ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধী। বাদামি গাছ ফড়িং, মাজরা পোকা, সবুজ গাছ ফড়িং ইত্যাদি পোকার আক্রমন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

বিনাধান-৮ ও লবণ চাষের জমি

লবণাক্ত এলাকায় হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৫.০ টন এবং অন্যান্য এলাকায় এটি হেক্টর প্রতি গড়ে ৭.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। এটি দেশের লবণাক্ত এলাকায় চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এছাড়া, এটি লবণাক্ত নয়, এমন এলাকাগুলিতেও চাষ করা যায়। এর বীজ পরিপক্ক অবস্থায় ঝরে পড়ে না।

বিনাধান-৯

বিনাধান-৯ এর কৌলিক সারি নং- আরসি-৪৩-২৮-৫-৩-৩। এটি স্থানীয় সুগন্ধি ধানের জাত কালিজিরা এর সাথে একটি উচ্চ ফলনশীল মিউট্যান্ট লাইন Y-1281 এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় এই কৌলিক সারিটিকে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচন করা হয়।

পূর্ন বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সে.মি. এবং হেলে পড়ে না; জীনবকাল ১২০-১২৫ দিন, ধানের রং মাতৃজাত কালিজিরার মত উজ্জ্বল কাল বর্ণের এবং বেশ লম্বা ও চিকন। ১০০০ ধানের ওজন ২০৩৭ গ্রা এবং ফলন ৩৭৫-৪২৫ টন/হেক্টর।

বিনাধান-৯ প্রচলিত সুগন্ধি আমন ধানের জাত কালিজিরা ও ব্রিধান-৩৮ অপেক্ষা উচ্চতায় কিছুটা খাট এবং প্রায় ২৫-৩০ দিন আগে পাকে। যেসব অঞ্চলে রবি শস্য, গম বা আলু করা হয় সে সব অঞ্চলের জন্য এ জাতটি উপযোগী। এ জাতটিতে পাতা পোড়া ও খোল পঁচা ইত্যাদি রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী। এছাড়া এটি প্রায় সব ধরনের পোকার আক্রমণ মোটামুটি ভালভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।

মাঠে বিনাধান-৯ ইনসেটে বীজ

বিশেষ গুন

জাতটির কান্ড শক্ত বলে হেলে পড়ে না, জীবনকাল তুলনামূলকভাবে কম বলে শস্য নিবিড়তা বাড়ানোর উপযোগী, মধ্যম ধরণের ফলন, চাল বাশমতির মত লম্বা, সরু এবং সুগন্ধিযুক্ত হওয়ায় রপ্তানী উপযোগী।

বিনাধান-১০

বিনাধান-১০ এর কৌলিক সারি নং IR64197-3B-14-2L। কৌলিক সারিটি ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় সংগ্রহ করা হয়। সারিটি IR42598-B-B-B-B-12 এবং NONA BOKRA এর সাথে সংকরায়ণের ফলে উদ্ভাবিত। কোলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবণাক্ত (১০-১২ ডিএস/মি) এলাকায় এবং লবণমুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় এবং চেক জাত বিনাধান-৮ এর চেয়ে ৭-১০ দিন আগে পাকায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। লবণ সহিষ্ণু উন্নত জাত হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য সারিটিকে বিনাধান-১০ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১২ সালে অনুমোদন দেয়া হয়।

বিনাধান-১০ একটি উচ্চ ফলনশীল ও ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন আলোক অসংবেদনশীল বোরো ধানের জাত। তবে আমন মৌসুমেও চাষ করা যায়। এটি কুশি অবস্থা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ১০-১২ ডিএস/মি এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া এবং লম্বা। পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা এবং কান্ড সবুজ থাকে। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সে.মি.। এ জাতের জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৫ গ্রাম।

মাঠে বিনাধান-১০ পাশেই চিংড়ির ঘের

ধান উজ্জ্বল, শক্ত এবং চাল লম্বা ও মাঝারী। জাতটি পাতা পোড়া, খোল পোড়া, খোল পঁচা ইত্যাদি রোগ তুলনামূলকভাবে বেশী প্রতিরোধ করতে পারে। মাজরা পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামী গাছ ফড়িং ইত্যাদি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশি। লবণাক্ত জমিতে বোরো মৌসুমে প্রতি হেক্টরে গড়ে ফলন ৫.৫ টন। লবণ মুক্ত স্বাভাবিক জমিতে বোরো মৌসুমে গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭.৫-৮.৫ টন। বিনাধান-১০ এর বীজ পরিপক্ক অবস্থায় ঝরে পড়ে না।

বিনাধান-১১

বিনাধান-১১ এর কৌলিক সারি নং IR09F436। কৌলিক সারিটি ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় সংগ্রহ করা হয়। সারিটি ইন্দোনেশিয়ার জাত চিহেরাং এবং ইরি ১৪৯ এর সাথে সংকরায়ণের ফলে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন (MAS) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন আকস্মিক বন্যাপ্রবন অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ২০-২৫ দিন জলমগ্ন হলেও প্রচলিত আমনের জাত থেকে বেশী ফলন প্রদান করে। ফলে উক্ত সারিটি আকস্মিক বন্যা এলাকার জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। ২০১৩ সনে জাতীয় বীজ বোর্ড এই কৌলিক সারিটিকে আকস্মিক বন্যা সহিষ্ণু ও স্বল্পমেয়াদী জাত হিসাবে সারা দেশে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিনাধান-১১ নামে অনুমোদন দেয়।

মাঠে বিনাধান-১১

বিনাধান-১১ এর বীজ

এ জাতের ডিগ পাতা গাঢ় সবুজ, খাড়া এবং লম্বা। ধানের দানা লম্বা ও মাঝারী। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সে. মি.। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এবং ২০-২৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্ন অবস্থায় থাকলে এর জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন। স্বাভাবিক অবস্থায় এর জীবনকাল ১১৫-১২০ দিন। জাতটি আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৮.১ গ্রাম। এর ফলন প্রচলিত জাতের তুলনায় হেক্টর প্রতি প্রায় ১ টন বেশী, কিন্তু জীবনকাল প্রায় ২৫-৩০ দিন কম।

বীজতলা কিংবা চারা রোপণের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলে চারা গাছের উপরের অংশ পঁচে গেলেও মূল গাছ পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিক ফলন দিয়ে থাকে। জলমগ্ন অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৪.৫-৫.০ টন ও জলমগ্ন না হলে ৫.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

বিশেষ গুণ

ধান চাষ বৃদ্ধির সাথে সাথে তেল ও ডাল জাতীয় শস্যের জমি কমে যাচ্ছে। এছাড়াও জমিতে আমন ধান থাকার কারনে বিভিন্ন ধরনের রবি শস্য সময়মতো আবাদ করা যাচ্ছে না। ফলে ঐ সমস্ত রবি ফসলের উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। বিনাধান-১১ উচ্চ ফলনশীল এবং এর জীবনকাল তুলনামূলকভাবে অনেক কম বিধায় শস্য নিবিড়তা এবং রবি ফসলের ফলন বাড়ানোর সুযোগ আছে। স্বল্পমেয়াদী ধানের জাত হিসাবে এ জাতটি চাষ করে আমনের উচ্চ ফলনসহ পরবর্তী ফসল হিসাবে আলু, গম, ভুট্টা, ডাল ও তেল জাতীয় ফসল সঠিক সময়ে চাষ করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বিনাধান-১২

বিনাধান-১২ এর কৌলিক সারি নং IR09F436। কৌলিক সারিটি ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় সংগ্রহ করা হয়। কৌলিক সারিটি সাম্বা মাহসুরি এবং আই আর ৪৯৮৩০ এর সংকরায়ণের ফলে সৃষ্ট F_1 এর সাথে

পূনরায় তিনবার পশ্চাদ সংকরায়ণ করে মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন (MAS) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে ২০-২৫ দিন জলমগ্ন হলেও প্রচলিত আমনের জাত থেকে বেশী ফলন প্রদান করায় উক্ত সারিটি আকস্মিক বন্যা এলাকার জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। ২০১৩ সনে জাতীয় বীজ বোর্ড এই জাতটিকে আকস্মিক বন্যা সহিষ্ণু জাত হিসাবে সারা দেশে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিনাধান-১২ নামে অনুমোদন দেয়।

এ জাতের ধানের চাল পোলাও, খিচুরী ও পিঠা তৈরীতে ব্যবহার করা যায়। এ জাতটির চাল মিনিকিটের মতো। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সে. মি.। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৬ গ্রাম। বীজতলা কিংবা চারা রোপনের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলে চারা ধানের উপরের অংশ পঁচে গেলেও মূল গাছ থেকে পুনরায় কুশি গজায় এবং ফলন ঠিক থাকে।

মাঠে বিনাধান-১২

বিনাধান-১২ এর বীজ

উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল জলমগ্ন (২০-২৫ দিন পর্যন্ত) অবস্থায় ১৪০-১৪৫ দিন। স্বাভাবিক অবস্থায় এর জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন। জাতটি আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। জলমগ্ন অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৪.০ টন ও জলমগ্ন না হলে ৪.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। জাতটি বোরো মৌসুমেও চাষ করা যায়।

বিনাধান-১৩

দেশীয় সুগন্ধি আমন ধানের জাত কালিজিরায় গামা রশ্মি ও ধুতুরা বীজের নির্যাস প্রয়োগের মাধ্যমে ভাল গুণাবলী সম্পন্ন একটি সুগন্ধি মিউট্যান্ট KD5-18-150 নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফলন ও অন্যান্য গুণাবলী পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ সালে এই মিউট্যান্টটি আমন মৌসুমে সারা দেশব্যাপী চাষাবাদের জন্য বিনাধান-১৩ নামে অনুমোদন লাভ করে।

পরিপক্ক অবস্থায় গাছের পাতা সবুজ থাকে। শীষের প্রায় সবগুলো দানাই পুষ্ট হয়। গাছ হেলে পড়ে না। ধান উজ্জ্বল কাল বর্ণের, বীজাবরণ শক্ত ও পরু। জীবনকাল ১৩৮-১৪২ দিন। ফলন হেক্টর প্রতি ৩.২-৩.৬ টন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১৪০-১৪৫ সে.মি.। ১০০০ ধানের

বিনাধান-১৩ এর বীজ

ওজন ১৩.২০ গ্রাম। প্রচলিত সুগন্ধি আমন ধানের মাতৃজাত কালিজিরার তুলনায় বিনাধান-১৩ সামান্য খাট, কান্ড শক্ত এবং মোটা। ধান ও চাল কালিজিরার তুলনায় সামান্য মোটা ও কম সুচালো।

পরিপক্ক অবস্থায় গাছের পাতা সবুজ থাকায় শীষের প্রায় সব দানাই সঠিকভাবে পরিপুষ্ট হয়। কালিজিরার তুলনায় বিনাধান-১৩ অধিক উজ্জ্বল, কাল বর্ণের, বীজাবরণ শক্ত ও পুরু। কালিজিরার চেয়ে ৫ দিন পরে এ জাতের শীষ বের হলেও দানা গঠন ও পরিপক্ক হতে ৩ দিন কম সময় লাগায় প্রায় একই সময় ফসল কাটা যায়।

বিনাধান-১৪

বিনাধান-১৪ এর মিউট্যান্ট সারি নং-আরএম(১)-২০০(সি)-১-১৭। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় জাত আশফল এর বীজে কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে কৌলিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাবী বোরো মৌসুমে অর্থাৎ লম্বা জীবনকাল সম্পন্ন সরিষা কাটার পরে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহ হতে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত রোপণ করে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় এই মিউট্যান্ট সারিটিকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

মাঠে বিনাধান-১৪

বিনাধান-১৪ এর বীজ ও চাউল

পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সে.মি. এবং হেলে পড়ে না, জীবনকাল ১০৫-১২৫ দিন, ধানের রং উজ্জ্বল স্বর্ণালী বর্ণের এবং বেশ লম্বা ও চিকন। ১০০০ ধানের ওজন ২৩.১৮ গ্রাম এবং ফলন ৬.০-৭.০ টন/হে.। বিনাধান-১৪ প্রচলিত স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বোরো ধানের জাত ব্রিধান-২৮ অপেক্ষা উচ্চতায় খাট এবং প্রায় ৪-৫ দিন আগে পাকে। ধান ও চাল ব্রিধান-২৮ এর মত লম্বা ও চিকন।

জীবনকাল কম হওয়ায় লম্বা জীবনকাল সম্পন্ন সরিষা কাটার পরে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের ৩য় সপ্তাহ হতে মার্চ মাসের ৪র্থ সপ্তাহ পর্যন্ত রোপণ করলেও মে মাসের ২য় সপ্তাহ হতে জুন মাসের ১ম সপ্তাহে কাটা যায়।

বিশেষগুণ

বোরো মৌসুমে নাবীতে রোপন করা যায় অর্থাৎ সরিষা, মসুর, খেসারী, শাক-সবজি ইত্যাদি আবাদের পর রোপণ করা যায় বিধায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকরী।

সতর্কতা

ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে রোপন করা যাবে না।

বিনাধান-১৫

বিনাধান-১৫ এর কৌলিক সারি নং- IR50। কৌলিক সারিটি ইরি-ফিলিপাইন হতে সংগ্রহ করা হয়। সারিটি IR 2153-14-1-6-2/IR 2061-214-38-2/IR 2071-625-1-252 এর সাথে সংকরায়ণের ফলে উদ্ভাবিত। সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় চেক জাত ব্রিধান-৩৮ হতে ফলন বেশি এবং ১৫-২০ দিন আগে পাকায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

এ জাতটি আলোক অসংবেদনশীল জাত। এ জাতের ডিগ পাতা গাঢ় সবুজ, খাড়া এবং কিছুটা চিকন। ধানের দানা মাঝারি চিকন। জাতটিকে রপ্তানীযোগ্য জাত হিসেবে ছাড়করন করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯৪ সে.মি.। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১১৫-১২০ দিন। জাতটি আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১ গ্রাম এবং গড় ফলন ৫.৮ টন/হেক্টর। পাকা ধানের রং খড়ের রং এর মতো।

মাঠে বিনাধান-১৫

বিনাধান-১৬

বিনাধান-১৬ এর কৌলিক সারি নং- OMCS-2007। কৌলিক সারিটি ইরি-ফিলিপাইন হতে সংগ্রহ করা হয়। সারিটি OM1314 এবং OMCS6 এর সাথে সংকরায়ণের ফলে উদ্ভাবিত। সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় চেক জাত বিনাধান-৭ হতে ফলন বেশি এবং ৭-১০ দিন আগে পাকায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

এ ছাড়া ইহা একটি স্বল্প মেয়াদী ও আলোক অসংবেদনশীল জাত। এ জাতের ডিগ পাতা গাঢ় সবুজ, খাড়া এবং কিছুটা প্রশস্ত। ধানের দানা লম্বা ও চিকন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৬-৯৮ সে.মি.। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। জাতটি আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৭.৪ গ্রাম এবং গড় ফলন ৫.৫ টন/হেক্টর। পাকা ধানের রং খড়ের রং এর মতো। এ জাতের গাছের কান্ড খুব শক্ত এবং তীব্র ঝড়ো আবহাওয়াতেও হেলে পড়ে না ও ধান ঝরে না।

মাঠে বিনাধান-১৬

বিনাধান-১৬ এর বীজ

বিনাধান-১৭

বিনাধান-১৭ এর কৌলিক সারি নং SAGC-7 সারিটি ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় ইরি-ফিলিপাইন হতে সংগ্রহ করা হয়। সারিটি C418/(ZHONG413)2 এর সাথে SH109/ (ZHONG413)2 সংকরায়ণ ও খরা সহিষ্ণু (ZHONG413)2 এর সাথে পশ্চাৎ সংকরায়ণ ও জিন পিরামিডিং এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। এটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় চেক জাত ব্রি ধান ৩৯ হতে প্রায় ২৫% বেশি ফলন এবং ৩-৪ দিন আগে পাকায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। ২০১৫ সনে জাতীয় বীজ বোর্ড এই কৌলিক সারিটিকে উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্পমেয়াদী জাত হিসেবে সারাদেশে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিনাধান-১৭ নামে অনুমোদন দেয়।

বিনাধান-১৭ উচ্চ ফলনশীল, স্বল্প মেয়াদী, খরা সহিষ্ণু (৪০% পানি কম প্রয়োজন), সার কম লাগে (৩০% ইউরিয়া কম লাগে), আলোক অসংবেদনশীল ও উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন রোপা আমন জাত। প্রতি গাছে ১২-১৪টি কুশি থাকে। ছড়া গড়ে ২৭ সে.মি. লম্বা। প্রতি শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা ২৫০-২৭০টি এবং শীষে দানাগুলো ঘনবিন্যস্ত অবস্থায় সন্নিবেশিত থাকে।

মাঠে বিনাধান-১৭

বিনাধান-১৭ এর বীজ

প্রচলিত জাতের তুলনায় সার (৩০%) কম মাত্রায় লাগে। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১১২-১১৮ দিন। জাতটি আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। আগাম পাকে বিধায় এটি কাটার পর সহজেই আলু, গম বা রবিশস্য চাষ করা যায়। পাকা ধান খড়ের রং এর মত উজ্জল। ধান ও চাল লম্বা ও চিকন, খেতে সুস্বাদু। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.৩ গ্রাম। আমন মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.৮ টন এবং সর্বোচ্চ ফলন ৮.০ টন। চালে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৪.৬%। রান্নার পর ভাত ঝরঝরে হয় এবং দীর্ঘক্ষণ রাখলে নষ্ট হয় না। জাতটি আমন মৌসুমের জন্য উপযুক্ত, তবে বোরো ও আউশ মৌসুমেও চাষ করা যায়।

বিশেষ গুণ

ধান চাষ বৃদ্ধির সাথে সাথে তেল ও ডাল জাতীয় শস্যের জমি কমে যাচ্ছে। ফলে এ দু'টি শস্যের মোট উৎপাদনও কমে গেছে। বিনাধান-১৭ উচ্চ ফলনশীল এবং এর জীবনকাল তুলনামূলকভাবে কম বলে শস্য নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য খুবই কার্যকর। সারাদেশের মাঝারী থেকে মাঝারী উঁচু জমিতে চাষাবাদ করা যায়। জাতটি বিভিন্ন রোগ ও পাতা পোড়া, খোল পচাঁ ও কান্ড পচাঁ ইত্যাদি বেশি প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়া এ জাতটির প্রায় সব ধরনের পোকার আক্রমণ বিশেষ করে বাদামী ঘাসফড়িং, গলমাছি ও পামরী পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। স্বল্পমেয়াদী হিসেবে এ জাতটি চাষ করে আমনের উচ্চ ফলনসহ আলু, গম, ডাল ও সরিষা ফসল সঠিক সময়ে চাষ করা যাবে এবং এসব ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। সঠিক সময়ে জাতটির চাষাবাদ কার্তিক মাসের মংগা মোকাবেলায় যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিনাধান-১৮

বিনাধান-১৮ এর মিউট্যান্ট সারি RM(2)-40(C)-1-1-10। এটি ব্রিধান-২৯ এর বীজে কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে এর কৌলিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় এই মিউট্যান্ট সারিটিকে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ সে.মি. ফলে হেলে পড়েনা। জাতটি মাতৃজাত ব্রিধান-২৯ অপেক্ষা ১৩-১৫ দিন আগে পাকে। বিনাধান-১৮ এর জীবনকাল স্বাভাবিক অবস্থায় বীজতলায় বীজ ফেলা থেকে ফসল পাকা অবধি ১৪৮-১৫৩ দিন। চাল লম্বা ও মাঝারী মোটা। ১০০০টি ধানের ওজন ২৬.৫ গ্রাম। চাল হাল্কা সুগন্ধিযুক্ত। গড় ফলন ৭.২৫ টন/হেক্টর ও সর্বোচ্চ ফলন ১০.৫ টন/হেক্টর। এটি কাটার পর কৃষক ভাইয়েরা সহজেই পরবর্তি আউশ ধান লাগাতে পারবেন।

মাঠে বিনাধান-১৮

বিনাধান-১৮ এর বীজ

বিনাধান-১৯

২০১৩ সালে জাপান এটমিক এনার্জি এজেন্সি থেকে NERICA-10 ধানের বীজকে ৪০ গ্রে মাত্রার কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয় বিনাধান-১৯। এর মিউট্যান্ট সারি নং N10-40(C)-1-5। প্রাথমিক পরীক্ষায় মিউট্যান্টটি খরা সহিষ্ণু প্রমাণিত হওয়ায় আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টিনির্ভর ও সরাসরি বপন (ডিবলিং) পদ্ধতিতে দেশের খরাপীড়িত বরেন্দ্র ও পাহাড়ী অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় মিউট্যান্টটি চেকজাত ব্রিধান-৪৩ ও মাতৃজাত NERICA-10 হতে উচ্চ ফলনশীল ও আগাম পরিপক্ক হওয়ায় ২০১৭ সালে চাষাবাদের জন্য বিনাধান-১৯ নামে অনুমোদন লাভ করে।

মাঠে বিনাধান-১৯

বিনাধান-১৯ এর বীজ

বিনাধান-১৯ এ আধুনিক উফশী আউশ ও আমন জাতের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। এটি আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলে সরাসরি বপন (ডিবলিং) পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। বীজতলা ও জমি কাদাকরণের প্রয়োজন পড়েনা। এ জাতটি রোপা আউশ হিসাবেও চাষ করা যায় । পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮০-৯০ সে.মি..।

গাছ খাট ও খাড়া বিধায় হেলে পড়েনা। জীবনকাল ৯০-১০৫ দিন এবং গড় ফলন ৪.৫ টন/হেক্টর। জাতটি আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। ১০০০ ধানের ওজন ২৩ গ্রাম। চাল সাদা রঙের, লম্বা ও চিকন। চালে আমিষের পরিমান শতকরা ৭.৩২ ভাগ ও অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৩.৮ ভাগ। রান্নার পরে ভাত ঝড়ঝড়া হয় ও খেতে সুস্বাদু। বিনাধান-১৯ ব্রিধান-৪৩ অপেক্ষা খাট, গাছ খাড়া থাকে ও বেশি ফলন দেয়। ধান ও চাল ব্রিধান-৪৩ অপেক্ষা চিকন।

বিশেষগুণ

প্রচন্ড খরার সময় এর বাড়বাড়তি প্রায় বন্ধ থাকে। আবার যখন বৃষ্টিপাত শুরু হয় তখন এটি অতি দ্রুত বাড়বাড়তি সম্পন্ন করে প্রায় স্বাভাবিক ফলন দিতে সক্ষম।

বিনাধান-২০

বিনাধান-২০ এর মিউট্যান্ট সারি নং RC-2-4-1-2। এটি বিনাশাইল এর সাথে ভিয়েতনামের একটি উচ্চ আয়রন সমৃদ্ধ প্রজনন সারির সাথে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় মিউট্যান্ট সারিটির আকাড়া চালে (Brown rice) উচ্চ আয়রন প্রাপ্তির পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হয়। এ সমস্ত পরীক্ষণে মিউট্যান্ট সারিটি ব্রিধান-৪৯ এর চেয়ে আগাম পরিপক্ক হওয়াসহ উচ্চ ফলন দেয়ায় ছাড়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। আকাড়া চালে আয়রন বেশি থাকলেও পলিশ করার পর আয়রণ ব্যাপকভাবে কমে যায় কিন্তু জিঙ্কের পরিমাণ আয়রণের তুলনায় বেশি পাওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড এটিকে জিঙ্কসমৃদ্ধ ধান হিসাবে ছাড় করে।

বিনাধান-২০ একটি উচ্চ জিঙ্কসমৃদ্ধ জাত। এর আকাড়া চালে ২৭.৫ পিপিএম জিঙ্ক ও ২৫-৩১ পিপিএম আয়রন থাকে। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সে.মি. এবং জীনবকাল ১২৫-১৩০ দিন। জাতটি আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। চাল লাল রঙের, খুব লম্বা ও চিকন। ১০০০ ধানের ওজন ২৫.৫ গ্রাম। চালে ২৬.৩% অ্যামাইলোজ থাকে। ভাত খেতে সুস্বাদু।

মাঠে বিনাধান-২০

বিনাধান-২০ এর বীজ ও চাউল

বিশেষগুণ

বিনাধান-২০ ব্রিধান-৪৯ অপেক্ষা ৫-৭ দিন আগে পাকে। ধান ও চাল খুব লম্বা ও চিকন। গড় ফলন ৪.৫ টন/হেক্টর ও সর্বোচ্চ ফলন ৫.৫ টন/হেক্টর। চাল উচ্চ জিঙ্ক ও আয়রন সমৃদ্ধ।

বিনাধান-২১

খরা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় আফ্রিকা হতে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় ধানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে। এ উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে NERICA-10 (New Rice for Africa) ধানের বীজকে ৩৫০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে একটি মিউট্যান্ট সারি N10/350/P-5-4 উদ্ভাবন করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় মিউট্যান্টটি খরা সহিষ্ণু প্রমাণিত হওয়ায় আউশ মৌসুমে দেশের খরাপীড়িত বরেন্দ্র অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় মিউট্যান্টটি চেকজাত ব্রিধান-২৬ ও মাতৃজাত NERICA-10 হতে উচ্চ ফলনশীল ও আগাম পরিপক্ক হওয়ায় ২০১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে কৃষক পর্যায়ে আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিনাধান-২১ নামে অবমুক্ত করা হয়।

মাঠে বিনাধান-২১

বিনাধান-২১ এর বীজ

পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৪-৯৬ সে.মি.। গাছ খাটো ও খাড়া বিধায় হেলে পড়ে না। জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। জাতটি আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। খরা প্রবণ এলাকায় গড় ফলন ৪.৫ টন/হেক্টর। ১০০০ ধানের ওজন ২১.৩ গ্রাম। চাল সাদা রঙের, লম্বা ও চিকন। চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৪.৯ ভাগ। রান্নার পরে ভাত ঝড়ঝড়া হয় ও খেতে সুস্বাদু। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বিনাধান-২১ প্রতি হেক্টরে ৪.৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

লবণাক্ত এলাকা ছাড়া দেশের খরা পীড়িত বরেন্দ্র অঞ্চলসহ প্রায় সকল উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমিতে এ জাতটির ভাল ফলন দেয়। বেলে দো-আঁশ এবং এঁটেল দো-আঁশ জমি বিনাধান-২১ চাষের জন্য উপযোগী। যে জমিতে পানি জমে থাকে সে সমস্ত জমি জাতটি চাষাবাদের উপযোগী নয়। বিনাধান-২১ খরা সহিষ্ণু জাত হওয়ায় শুষ্ক মাটি বেশি পছন্দ করে। খরা সহিষ্ণু এ জাতটির চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য আউশ ধানের মতো। এ জাতের বীজ আউশ মৌসুমে মধ্য মার্চ (১ চৈত্র) থেকে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ (১৫ বৈশাখ) পর্যন্ত বপন করা যায়।

বিনাধান-২২

বিনাধান-২২ এর মাতৃজাত MR219। মাতৃজাতটি মালয়েশিয়া হতে সংগ্রহ করে 250Gy গামা রশ্মি প্রয়োগ করে মিউট্যান্ট লাইন BINA-MV-20 উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীতে এই মিউট্যান্ট লাইনটি M_4, M_5, M_6 জেনারেশনে ফলন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে ছাড়করণের জন্য চূড়ান্ত করা হয়। এটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় চেক জাত বিনাধান-৭ হতে বেশি ফলন এবং স্বল্প মেয়াদী বিধায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

বিনাধান-২২ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যামান। এ ছাড়া ইহা একটি আলোক অসংবেদনশীল জাত। এ জাতের ডিগ পাতা গাঢ় সবুজ, খাড়া এবং কিছুটা মোটা। ধানের দানা লম্বা চিকন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯৭.৫ সে.মি..। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১১২-১১৫ দিন। জাতটি

মাঠে বিনাধান-২২

বিনাধান-২২ এর বীজ

আগাম বিধায় ২০-২৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৫.২ গ্রাম পাকা ধানের রং খড়ের রং এর মতো। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম হয়। গড় ফলন ৬.১ টন/হেক্টর এবং সর্বোচ্চ ফলন ৬.৫ টন/হেক্টর।

বিনাধান-২৩

(জোয়ারভাটা কবলিত এলাকার জন্য আমন মৌসুম উপযোগী)

বিনাধান-২৩ এর কৌলিক সারি নং- IR11T183। কৌলিক সারিটি ইরি-ফিলিপাইন হতে সংগ্রহ করা হয়। সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের জোয়ারভাটা অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় চেক জাত (জোয়ারভাটা কবলিত এলাকার জন্য আমন মৌসুম উপযোগী ব্রি ধান৭৮) হতে (ফলন প্রায় ১৫% বেশি এবং ৮-১০ দিন আগে পাকে। উচ্চ ফলনশীল ও আগাম পরিপক্ক হওয়ায় ২০১৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য বিনাধান-২৩ নামে অবমুক্ত করা হয়।

মাঠে বিনাধান-২৩

বিনাধান-২৩ এর বীজ

বিনাধান-২৩ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। জাতটি আলোক-অসংবেদনশীল। জাতটি ৮ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা ও ১৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে। ধানের চাল মাঝারি চিকন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১১৮ সে.মি.। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১১৫-১২৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১.৮ গ্রাম। বিনাধান-২৩ এর গড় ফলন ৫.৩ টন/হেক্টর। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জাতটি হতে প্রতি হেক্টরে ৫.৮ টন ফলন পাওয়া যায়।

বিনাধান-২৪

বিনাধান-২৪ এর মাতৃজাত Tap Hanh। মাতৃজাতটি ভিয়েতনাম হতে 250 গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে মিউট্যান্ট লাইন BINA-THDB উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীতে এই মিউট্যান্ট লাইনটি M_4, M_5, M_6 জেনারেশনে ফলন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে ছাড়করণের জন্য চূড়ান্ত করা হয়। এটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় চেক জাত ব্রি ধান২৮ হতে বেশি ফলন এবং স্বল্প মেয়াদী বিধায় জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

মাঠে বিনাধান-২৪

বিনাধান-২৪ এর বীজ

বিনাধান-২৪ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ ছাড়া ইহা একটি আলোক অসংবেদনশীল জাত। এ জাতের ডিগ পাতা গাঢ় সবুজ, খাড়া এবং কিছুটা মোটা। ধানের দানা লম্বা ও মাঝারি চিকন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯৫ সে.মি.। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১৪৫ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৭.৫ গ্রাম। পাকা ধানের রং খড়ের রং এর মতো।

বিনাধান-২৪ আলোক অসংবেদনশীল জাত। এ জাতটি উচ্চফলনশীল, স্বল্প মেয়াদী এবং গাছ শক্ত বলে হেলে পড়ে না। বোরো মৌসুমে প্রতি হেক্টরে গড় ফলন ৬.৫ টন পর্যন্ত পাওয়া যায় । প্রস্তাবিত বিনাধান-২৪ এর ফলন চেক জাত ব্রি ধান২৮ থেকে হেক্টর প্রতি প্রায় ১.৫ টন বেশী। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রস্তাবিত বিনাধান-২৪ বোরো মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৯.০ টন ফলন পাওয়া যায়।

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতই। নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে (অগ্রহায়ন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ)। ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা গোছা প্রতি ২/৩ টি রোপন করতে হবে। সারি থেকে সারি এবং গোছার দূরত্ব যথাক্রমে ২০ এবং ১৫ সে. মি.। সারের মাত্রা যথাক্রমে নাইট্রোজেন:ফসফরাস:পটাশ:সালফার:জিংক/হেক্টর (১২০:৯০:৬০:৩৫:৩ কেজি)। নাইট্রোজেন সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১২ দিনের মধ্যে ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করা উচিত। নাইট্রোজেন সার ব্যতিত অন্যান্য সম্পূর্ন সার জমি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জমির উর্বরতা অনুযায়ী নাইট্রোজেন সারের মাত্রা কম-বেশী হতে পারে।

প্রস্তাবিত বিনাধান-২৪ এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাতের চেয়ে কম হয়। তবে প্রয়োজনে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ।

ধানের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটি ধান চাষের উপযোগী। বিনা উদ্ভাবিত ধানের জাতের চাষাবাদ পদ্ধতি মোটামুটিভাবে দেশে ব্যবহৃত অন্যান্য উফশী জাতের চাষাবাদ পদ্ধতির অনুরূপ।

জমি তৈরি

জমিতে প্রয়োজনমত পানি দিয়ে দু'থেকে তিনটি চাষ ও মই দিতে হবে যেন সমস্ত মাটি সমভাবে থকথকে কাঁদাময় হয়। সময়মত ও উত্তমরূপে জমি তৈরি করলে প্রাথমিকভাবে যেসব আগাছা জন্মায় তা দমন সহজ হয়। প্রথম চাষের পর অন্তত জমিতে সাত দিনের মত পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। এতে আগাছা, খড় ইত্যাদি পঁচে যাবে।

বীজতলায় বীজ বপনের সময়

বোরো মৌসুম: নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে শুরু করে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ (অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ থেকে পৌষের প্রথম সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজতলায় বীজ ফেলার উপযুক্ত সময়। বীজতলা করার কয়েকদিন পূর্বে বীজ ২/১ দিন রোদে শুকালে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বীজতলায় বিনাধান-৬ এর বীজ ফেলার পূর্বে ৩৬-৪০ ঘন্টা পানিতে ভিজালে অংকুরোদগম ভাল হয়। ১০ কেজি বীজ ৫ শতাংশ বা ২০০ বর্গমিটার বীজ তলায় ফেলা যায়। রোপণের সময় চারার বয়স ৫/৬ সপ্তাহ হওয়া প্রয়োজন। তবে বিনাধান-৬ এর জন্য ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের চারা লাগানো যায়।

আউশ মৌসুম: ১ থেকে ২১ এপ্রিল (চৈত্রের ৩য় সপ্তাহ হতে বৈশাখের ১ম সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজ তলা তৈরির উপযুক্ত সময়।

আমন মৌসুম: জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ (আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজ তলায় বীজ ফেলা যায়।

বীজতলার যত্ন

সুস্থ সবল চারা তৈরি করতে হলে বীজতলায় বীজ বপনের পর বিশেষভাবে যত্ন নেয়া দরকার। বীজতলার জমিতে পরিমিত পানি রাখা দরকার। জমিতে সব সময় পানি থাকলে অনেক সময় চারার বাড়-বাড়তি কমে যায় এবং চারা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই মাঝে মাঝে বীজতলা শুকালে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। উর্বর ও মধ্যম উর্বর জমিতে বীজতলা তৈরি করলে কোনরূপ সার প্রয়োজন হয় না। অনুর্বর ও স্বল্প উর্বর জমিতে কেবল প্রতি বর্গমিটারে দু'কেজি গোবর বা পঁচা আবর্জনা সার প্রয়োগ করলেই চলে। চারা গজানোর পর গাছ হলুদ হয়ে গেলে দু'সপ্তাহ পর প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের পর জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করা যাবে না। বোরো মৌসুমে শীতের কারণে চারা লালচে বা হলুদ হয়ে যায়, যাকে টুংরা রোগ বলে অনেকেই ভুল করেন। এ ক্ষেত্রে ইউরিয়া প্রয়োগে কাজ না হলে বীজতলায় প্রতি বর্গমিটারে ২০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করলে চারার বৃদ্ধি ভালো হয়।

দুর্বল, নরম ও লিকলিকে চারা গাছ সহজেই রোগ ও পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ কারণে চারা গাছ সামান্য হলুদ ও শক্ত কান্ড বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। চারা যত্নসহকারে উঠানো দরকার, যাতে চারা গাছের

কান্ড ভেঙ্গে না যায়। চারা গাছের শিকড় ছিড়ে গেলে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্ত পাতা ছিড়ে বা কান্ড মচকে গেলে চারা গাছের বিশেষ ক্ষতি হয়। তাই চারা উঠানোর পূর্বে বীজতলায় বেশি করে পানি দিতে হবে যাতে বীজতলার মাটি ভিজে নরম হয়। বস্তাবন্দি অবস্থায় চারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা যায়। তবে বস্তাবন্দি অবস্থায় চারা ৫-৬ দিনের বেশি রাখা যাবে না।

বীজের হার

প্রতি হেক্টর জমি চাষের জন্য ২৫-৩০ কেজি বা এক একর জমির জন্য ১০-১২ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজ বাছাই ও শোধন

ভারি, পুষ্ট, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণমুক্ত পরিষ্কার বীজ বপন করতে হবে। পাঁচ শতাংশ বীজতলায় ১০ কেজি হারে বীজ বপন করতে হবে। বপনের আগে বীজ শোধন করে নেয়া ভাল (প্রতি ১০ কেজি বীজে ২৫ গ্রাম প্রোভ্যাক্স-২০০ ব্যবহার করা যেতে পারে)।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি তৈরির শেষ চাষের সময় টিএসপি ও এমওপি জমিতে সমভাবে ছিটিয়ে চাষের মাধ্যমে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সমান তিন ভাগে ভাগ করে চারা রোপণের ৭, ৩০ ও ৫৫ দিন পর জমিতে দিতে হবে। বিভিন্ন জাতের জীবনকালের ভিত্তিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি প্রয়োগের সময় কিছু তারতম্য হবে, যেমন- আগাম পাকা জাত বিনাধান-৭ এর ক্ষেত্রে ২০ ও ৪০ দিন পর যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারের ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে লিফ কালার চার্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। এই চার্টের দ্বারা ধান গাছের পাতার রঙের গাঢ়ত্ব বুঝে জমিতে কী পরিমাণ ইউরিয়া সারের প্রয়োজন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে। বীজ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আবাদকৃত জমিতে শেষ চাষের সময় এমওপি সার সম্পূর্ণ না দিয়ে ২/৩ ভাগ প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ১/৩ ভাগ কাইচ থোর আসার পূর্বে উপরি প্রয়োগ করলে বীজের মান ভাল হয়।

ইউরিয়া সার প্রয়োগের ২/১ দিন আগে জমির অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়া এবং জমি আগাছা মুক্ত রাখা প্রয়োজন। জমিতে জিংক এবং সালফারের অভাব থাকলে যথাক্রমে ১০ এবং ৮৫ কেজি/হে হারে জিংক সালফেট ও জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। এলাকা ও জমির উর্বরতা অনুযায়ী সারের মাত্রা কম বেশি হতে পারে।

সারণী-১: হেক্টর/একর প্রতি সারের পরিমাণ

জাতের নাম	জমির পরিমাণ	বিভিন্ন সারের প্রয়োগ মাত্রা (কেজি)				
		ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	দস্তা
বিনাশাইল	হেক্টর প্রতি	১৮০-২২০	৪০-৫০	৬০-৮০	৪০-৫০	২.০-৩.০
	একর প্রতি	৩২-৯০	১৮-২৪	২০-৩০	১২-১৮	০.৮-১.০
ইরাটম-২৪	হেক্টর প্রতি	১০০-১২০	৫০-৬০	৫০-৭০	৩০-৪৫	২.০-৩.০
	একর প্রতি	৩২-৪০	২০-২৪	১৮-২৬	১২-১৮	০.৮-১.০
বিনাধান-৪	হেক্টর প্রতি	১৮০-২০০	৫০-৬০	৮০-১০০	৫০-৬০	৩.০-৫.০
	একর প্রতি	৬০-৮০	২০-৩০	২৮-৪০	২০-২৪	১.২-২.০
বিনাধান-৫	হেক্টর প্রতি	২০০-২৪০	৮০-১০০	১২০-১৫০	৬০-৮০	৩.০-৬.০
	একর প্রতি	৭২-৮০	৩০-৪০	৪০-৬০	২০-২৪	১.২-২.৪
বিনাধান-৬	হেক্টর প্রতি	২০০-২৫০	১০০-১৫০	১৫০-২০০	৮০-১০০	৩.০-৬.০
	একর প্রতি	৮০-১০০	৪০-৬০	৪৮-৮০	২০-৪০	১.২-২.৪
বিনাধান-৭	হেক্টর প্রতি	১৫০-১৮০	১১০-১২০	৬০-৮০	৫০-৬০	১.০-৫.০
	একর প্রতি	৬০-৭২	৪৫-৫০	২০-৩০	২০-২৪	০.৮-২.০
বিনাধান-৮	হেক্টর প্রতি	২১০-২২০	১১০-১১৫	৮০-১০০	৫০-৬০	৪.২-৪.৬
	একর প্রতি	৮০-৯০	৪৫-৫০	২৫-৩০	১৫-২০	১.৬-২.০
বিনাধান-১০	হেক্টর প্রতি	২১০-২২০	১১০-১১৫	৮৫-১০০	৫০-৬০	৪.২-৪.৬
	একর প্রতি	৮০-৯০	৪৫-৫০	২৫-৩০	১৫-২০	১.৬-২.০
বিনাধান-১১	হেক্টর প্রতি	১৫০-১৮০	১১০-১২০	৫০-৭০	২০-৩০	৩.৫-৪.৫
	একর প্রতি	৬০-৭০	৪৫-৫০	২০-৩০	১০-১৫	১.৫-২.০
বিনাধান-১২	হেক্টর প্রতি	১৫০-১৮০	১১০-১২০	৫০-৭০	০৮-১২	৩.৫-৪.৫
	একর প্রতি	৫৫-৭০	৪৫-৫০	২০-৩০	০৩-০৪	১.৫-২.০
বিনাধান-১৩	হেক্টর প্রতি	১৬৫-১৮৫	৮৫-১১৫	১২০-১৫০	৯০-৯৮	৪.০-৫.০
	একর প্রতি	৬৬-৭৫	৩৫-৪৫	৫০-৬০	৩৮-৪০	১.৭-২.০
বিনাধান-১৪	হেক্টর প্রতি	২২০-২৬০	১০০-১২৫	১৪০-১৮০	৬০-৮০	৬.৫-৭.০
	একর প্রতি	৯০-১০৫	৪০-৫০	৫৫-৭০	২৫-৩০	২.৫-৩.০
বিনাধান-১৫	হেক্টর প্রতি	১৪০-১৬০	১০০-১২০	৬০-৮০	৫০-৬০	২.৫-৩.০
	একর প্রতি	৫৭-৬৫	৪০-৫০	২৫-৩০	২০-২৫	০.৫-২.০
বিনাধান-১৬	হেক্টর প্রতি	১৪০-১৬০	১০০-১২০	৬০-৮০	৫০-৬০	১.০-৫.০
	একর প্রতি	৫৫-৬৫	৪০-৫০	২৫-৩০	২০-২৫	০.৫-২.০
বিনাধান-১৭	হেক্টর প্রতি	১২০-১৩০	৮০-১০০	৩০-৫০	২৫-৩৫	১.০-৪.০
	একর প্রতি	৪৫-৫৩	৩০-৪০	১৫-২০	১০-১৫	০.৪-১.৫
বিনাধান-১৮	হেক্টর প্রতি	২৬০-৩২৫	১০০-১৪০	১০০-১৪০	৬৬-১১০	৫.৫-৬.০
	একর প্রতি	১০৫-১৩২	৪০-৫৭	৪০-৫৭	১৭-৪৫	২.২-৩.০
বিনাধান-১৯	হেক্টর প্রতি	১৬৩-১৮৫	৭৫-১০০	৬০-৮০	৬৬-৮৮	৫.৬-৩.০
	একর প্রতি	৬৬-৭৫	৩০-৪০	২৪-৩২	২৭-৩৬	২.০-৩.০
বিনাধান-২০	হেক্টর প্রতি	১৮০-১৯৫	৪৫-৫০	৬৫-৭০	৫০-৫৫	৫.০-৫.৬
	একর প্রতি	৭০-৮০	১৫-২০	২৫-৩০	১৫-২০	২.০-২.৫
বিনাধান-২১	হেক্টর প্রতি	১৬০-১৮৫	৭৫-১০০	৬০-৮০	৬৫-৮৮	৫.৫৬
	একর প্রতি	৬৫-৭৫	৩০-৪০	২৪-৩২	২৬-৩৬	২.০
বিনাধান-২২	হেক্টর প্রতি	১০০-১১০	৮০-১০০	৩০-৩৫	২৫-৩৫	১.০-৩.০
	একর প্রতি	৪০-৪৪	৩২-৪০	১২-১৪	১০-১৪	০.৪-১.২
বিনাধান-২৩	হেক্টর প্রতি	১৪০-১৬০	১০০-১২০	৬০-৮০	৫০-৬০	১.০-৫.০
	একর প্রতি	৫৭-৬৫	৪০-৫০	২৪-৩২	২০-২৪	০.৫-২.০
বিনাধান-২৪	হেক্টর প্রতি	২৩০-২৫০	১১০-১২০	৬০-৮০	৪৫-৫০	৩-৪
	একর প্রতি	৯৫-১০০	৪০-৫০	৪৫-৫০	১৮-২০	১-১.৫

রোপণ পদ্ধতি

বোরো মৌসুম:

জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ (পৌষের শেষ থেকে মধ্য মাঘ) পর্যন্ত ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা প্রতি গোছায় ২/৩টি রোপণ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। সারি হতে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি (২০ সে.মি.) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সে.মি.) বজায় রাখতে হবে।

আউশ মৌসুম:

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ (মধ্য বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ) পর্যন্ত আউশ ধান রোপণের উপযুক্ত সময়। রোপণের সময় চারার বয়স ২০-২৫ দিন হওয়া প্রয়োজন। চারা লাগানোর সময় সারি হতে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি (২৫ সে.মি.) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সে.মি.) বজায় রাখতে হবে।

আমন মৌসুম:

জুলাই মাসের শেষ (শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয়) সপ্তাহের মধ্যে ২০-২৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ২ বা ৩টি সুস্থ সবল চারা একত্রে এক গুছিতে রোপণ করতে হবে। সারি হতে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি (২০ সে.মি.) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সে.মি.) বজায় রাখতে হবে।

ফসলের পরিচর্যা

- চারা রোপণের পর থেকে ক্ষেতে ৩-৫ সে.মি. এবং গাছ বড় হবার সাথে সাথে পানির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে। ক্ষেতে অধিক পানি জমে গেলে মাঝে মাঝে পানি বের করে দিয়ে জমি শুকিয়ে ফেলতে হবে এবং পরে আবার পানি দিতে হবে। তবে ধান গাছে থোড় হওয়ার সময় অবশ্যই জমিতে ৩-৫ সে.মি. পানি থাকা প্রয়োজন। ধান পাকার ১০/১৫ দিন আগেই জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে।

- চারা রোপণের পর ১০/১৫ দিন অন্তর অন্তর নিড়ানি অথবা হাত দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। বীজ গজানোর পর আউশ ধানের ক্ষেত্রে ৩০-৩৫ দিন, রোপা আমনের ক্ষেত্রে ৩৫-৪০ দিন এবং বোরো ধানের ক্ষেত্রে ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

আগাছা দমন পদ্ধতি

বোনা আউশ/আমন/বোরো:

- বোনা আউশ/আমন/বোরো ধানের বীজ বপন থেকে শুরু ৪৫ দিন পর্যন্ত জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করে এবং আগাছানাশক প্রয়োগের মাধ্যমে জমির আগাছা দমন করা যায়।
  - বোনা আউশ/আমন/বোরো ধানের দু'বার হাত দিয়ে আগাছা দমন করতে হয়। প্রথমবার বীজ গজানোর ১৫-২০ দিন এবং দ্বিতীয়বার ৩০-৩৫ দিন পর।
  - নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে সারিতে বপনকৃত ধানের দু'সারির মাঝের আগাছা দমন করা যায়। কিন্তু দু'গুছির ফাঁকে যে আগাছা থাকে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। যান্ত্রিক দমনে অবশ্যই সারিতে ধান বপন করতে হবে।
  - প্রি বা পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রি ইমারজেন্স হিসেবে প্রিটাইলাক্লোর, পেন্ডামিথাইলিন, অক্সাডায়ারজিল, সারফেন্ট্রাজন গ্রুপ এর আগাছানাশক বীজ বপনের ৫ দিনের মধ্যে জো অবস্থায় মাটিতে স্প্রে করতে হবে।
  - পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম, ফেনক্সলাম, পাইরাজো সালফুরান

ইথাইল, ইথোক্সোসালফুরান ইত্যাদি গ্রুপ এর আগাছানাশক আগাছা ২-৩ পাতা হওয়ার সাথে সাথে জমিতে স্প্রে করতে হবে।

রোপা আউশ/আমন/বোরো:

- রোপা আউশ/আমন/বোরো ধানের চারা রোপণ থেকে শুরু করে ৩৫ দিন পর্যন্ত জমিকে আগছামুক্ত রাখতে হবে।
- হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করে এবং আগাছানাশক প্রয়োগের মাধ্যমে জমির আগাছা দমন করা যায়।
- রোপা আউশ/আমন/বোরো ধানে দু'বার হাত দিয়ে আগাছা দমন করতে হয়। প্রথমবার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর প্রথম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার ৩০ দিন পর।
- প্রি বা পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রি ইমারজেন্স আগাছানাশক প্রিটাইলাক্লোর, পেন্ডামিথাইলিন, অক্সাডায়ারজিল, সারফেন্ট্রাজন গ্রুপ রোপণের ৩-৬ দিনের মধ্যে জমিতে ২-৩ ইঞ্চি পানি থাকা অবস্থায় স্প্রে করতে হবে।
- পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম, ফেনক্সলাম, পাইরাজো সালফুরান ইথাইল, ইথোক্সোসালফুরান রোপণের ১০-১৫ দিনের মধ্যে আগাছার ২-৩ পাতা হওয়ার সাথে সাথে জমিতে স্প্রে করতে হবে।

রোপা আউশ মৌসুমে আগাছানাশক প্রয়োগের পর সাধারণত হাত নিড়ানির প্রয়োজন হয় না। তবে আগাছার ঘনত্ব বেশি হলে আগাছানাশক প্রয়োগের ২৫ দিন পর হাত দিয়ে একবার নিড়ানি দেয়া প্রয়োজন।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

সারণী-২: ধান ফসলে ক্ষতিকর মুখ্য পোকাসমূহের নাম, আক্রমণকাল ও ফসলের ওপর প্রভাব

ক্ষতিকর পোকা	সর্বোচ্চ আক্রমণের সময়	ফসলে আক্রমণের স্তর	পোকারা যে সব স্তরে ক্ষতি করে	লক্ষণ
মাজরা	এপ্রিল-অক্টোবর	কুশি ও শীষ অবস্থায়	কিড়া	গোড়া থেকে মাইজ কেটে দেয়; ফলে মরা ডিগ ও সাদা শীষ দেখা দেয়।
বাদামি গাছ ফড়িং	মার্চ- নভেম্বর	সর্বাধিক কুশি, থোড় ও শীষ অবস্থায়	বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক	গাছের গোড়া থেকে দলবদ্ধভাবে রস চুষে খায়; ফলে গাছ নিস্তেজ হয়ে শুকিয়ে যায় ও পোড়া লক্ষণ দেখা যায়।
গল মাছি	জুলাই- অক্টোবর	বাড়ন্ত কুশি অবস্থায়	কিড়া বা ম্যাগোট	মাঝখানের বাড়ন্ত কুশি পিঁয়াজ পাতার মত হয়ে যায়।
চুঙ্গি	আগস্ট-অক্টোবর	চারা ও কুশি গজানো অবস্থায়	কিড়া	সবুজ অংশ কুড়ে খায়, চোঙা তৈরি করে কাটা চোঙা জমির পানির উপরি ভাগে ভাসতে থাকে; পাতা সাদা হয়ে যায়।
পাতা মোড়ানো	মার্চ- অক্টোবর	কুশি গজানো, থোড় ও শীষ অবস্থায়	কিড়া	পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়ে ভিতরের সবুজ অংশ খায়; বেশি ক্ষতি হলে পাতা খাওয়া দেখায়।
গান্ধি	এপ্রিল-অক্টোবর	দুধ অবস্থায়	বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক	দানা থেকে দুধ চুষে খেয়ে চিটা করে ফেলে।
শীষকাটা লেদা পোকা	এপ্রিল- নভেম্বর	পাকা অবস্থায়	কিড়া	শীষের গোড়া থেকে কেটে দেয়

নিবিড় ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি প্রবতনের ফলে সাধারণত পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়। এজন্য

ক্ষতিকারক পোকামাকড় ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। ধানের প্রধান ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২০-৩০টি। ধান ক্ষেতে পোকা দেখা গেলেই কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ জমিতে ক্ষতিকর পোকার অনেক প্রাকৃতিক শত্রু যেমন- মাকড়সা, লেডিবার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটলসহ অনেক পরজীবী ও পরভোজী পোকামাকড় থাকে। সুতরাং প্রয়োজন না হলে এ সকল উপকারী পোকামাকড় কীটনাশক স্প্রে করে মেরে ফেলা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বালাই নাশক প্রয়োগ করার উপযুক্ত সময়

পোকার নাম	যে পরিস্থিতিতে বালাইনাশক প্রয়োগ প্রয়োজন
ধানের মাজরা পোকা	ক) ধান রোপণের ৪০ দিন বয়সের মধ্যে মরা ডিগ (মধ্যকুশি) ১০% দেখা গেলে অথবা রোপণের ৪০-৬০ দিন বয়সের মধ্যে ৫% সাদা ছড়া (চূড়ান্ত কুশি) দেখা। খ) প্রতি বর্গমিটারে ৩ থেকে ৫টি ডিমের গাদা বা মথ দেখা দিলে।
সবুজ পাতা ফড়িং	হাতজালের প্রতি টানে গড়ে দুইটি পোকা পাওয়া গেলে ও আশেপাশে টুংরা আক্রান্ত গাছ থাকলে।
গল মাছি	কুশির ৫% পেঁয়াজ পাতার মত দেখা গেলে।
বাদামি গাছ ফড়িং	প্রতি গোছায় ২-৪টি গর্ভবতী স্ত্রী পোকা বা প্রতি গোছায় ১০টি করে নিম্ফ থাকলে।
গান্ধি পোকা	প্রতি গোছায় ২-৩টি পোকা পাওয়া গেলে।
শীষ কাটা লেদা পোকা	প্রতি ১০ বর্গমিটারে ২-৪টি পোকা পাওয়া গেলে।

ধানের সম্ভাব্য ক্ষতিকারক পোকাসমূহের দমন ব্যবস্থা

পোকার নাম	দমন ব্যবস্থা
থ্রিপস (বীজতলা ও বোনা ধানে	আক্রমণ বেশি হলে ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপ এর কীটনাশক যেমন- ডার্সবান, মর্টার ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে।
মাজরা পোকা	ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল+থায়োমেক্সাম গ্রুপের ভিরতাকো ৪০ ডাব্লিউজি (৭৫ গ্রাম/হে), তাজরি ৫০ এসপি (১.৪ কেজি/হে), বেল্ট ২৪ ডব্লিউজি (২০০ গ্রাম/হে), ফুরাডান ৫জি (১০ কেজি/হে), মার্শাল ২০ ইসি (১.৫০ লিটার/হে), ডারস্বান ২০ ইসি (১.০০ লিটার/হে)
গান্ধি পোকা (দুধ অবস্থায়)	মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি (১.১২ কেজি/হে), ডারস্বান ২০ ইসি (১.০০ লিটার/হে), ফাইফানন ৫৭ ইসি (১.১২ লিটার/হে), সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি (১.৭০ কেজি/হে)
ঘাস ফড়িং	প্লিনাম ৫০ ডব্লিউজি (০.৫ কেজি/হে), মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি (১.৩০ কেজি/হে), লাহিব ৩৮ ডব্লিউজি (৭৫ গ্রাম/হে), এডমায়ার ২০ এসএল (১২৫ মিলি/হে), একতারা ২৫ ডব্লিউজি (৬০ গ্রাম/হে), পাটিনাম ২০ এসপি (৫০ গ্রাম/হে), মার্শাল ২০ ইসি (১.০০ লিটার/হে), ডারস্বান ২০ ইসি (১.০০ লিটার/হে)
পাতা মোড়ানো পোকা ও চুঙ্গি পোকা	আক্রমণ বেশি ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল গ্রুপের কোরাজেন ১৮.৫ ইসি (১৫ লি/হে) বা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল+থায়োমেক্সাম গ্রুপের ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউজি (০.০৭৫ কেজি)। এছাড়া ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি (১.০ লি/হে), ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ ইসি (১.০ লি/হে), ফজালোন ৩৫ ইসি (১.০ লি/হে)

সারণী-৩: ধান ফসলে মুখ্য রোগসমূহের নাম, আক্রমণকাল ও ফসলের ওপর প্রভাব

রোগের নাম	মৌসুম	আক্রমণের সময়	ফসলের যে অবস্থায় আক্রমণ করে	লক্ষণ
টুংরো	আউশ, রোপা আমন	মে-জুন, অক্টোবর	কুশি, ফুলন্ত অবস্থায়	গাছ খাটো, পাতা হলদে, কমলা ও কচি পাতা মুচড়ে যায়।
ব্লাস্ট	রোপা আমন, বোরো	নভেম্বর-মার্চ	চারা থেকে পাকা	পাতা, গিঁট ও শীষ আক্রান্ত হয়;

খোল পোড়া	আউশ, আমন	মে, নভেম্বর- ডিসেম্বর	কুশি অবস্থায়	গাছের গোড়া থেকে খোলে জল ছাপের মত দাগ পড়ে গোখরা সাপের চামড়ার মত দেখায়।
পাতা পোড়া	আউশ, আমন, রোপা	মে, মধ্য আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর	চারা, কুশি	চারা বা কুশি সম্পূর্ণ পচে গন্ধ বের হয়, পাতার অগ্রভাগ থেকে দু'কিনারা বরাবর শুকিয়ে আসতে থাকে। শেষে শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে যায়।
উফরা	আমন	অক্টোবর	সব অবস্থায়	পাতা ও খোলের সংযোগ স্থলে বাদামি দাগ পড়ে, পুরো পাতা শুকিয়ে যায়, থোড় থেকে ছড়া বের হতে পারে না বা আংশিক বের হয়, গাছ বেঁটে হয়।

ধানের সম্ভাব্য ক্ষতিকারক রোগসমূহের দমন ব্যবস্থা

রোগের নাম	দমন ব্যবস্থা
খোলপচা	ফলিকুর (৬৬ মিলি/বিঘা), নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা), স্কোর (৬৬ মিলি/বিঘা) ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ৬৬ লিটার পানিতে মিশিয়ে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
পাতাপোড়া	রোগের প্রথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। থোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা/ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করা।
ব্লাস্ট	পাতা ব্লাস্ট হলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ট্রুপার (৫৩ গ্রাম/বিঘা), নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা) অথবা জিল (৫৮ গ্রাম/বিঘা) নামক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। যেসব জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি অথব উক্ত এলাকায় রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে, সেখানে ধানের শিষ বের হওয়ার সাথে সাথেই অথবা ফুল আসা পর্যায়ে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন ট্রুপার (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা) অথবা ট্রাইসাক্লাজল গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৬৬ লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার আগাম স্প্রে করতে হবে। থোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
টুংরো রোগ	আশেপাশে টুংরো রোগাক্রান্ত ধান গাছ থাকে, তাহলে বীজতলায় বা জমিতে কীটনাশক যেমন- মিপসিন, সেভিন অথবা ম্যালথিয়ন অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

ফসল কর্তন, মাড়াই-ঝাড়াই ও বীজ সংরক্ষণ

সদ্য মাড়াইকৃত এবং গুদামজাতকৃত ধানের গুণগতমানের ক্রমাবনতি এবং বীজধানের কম অংকুরোদগম ক্ষমতা আমাদের দেশে একটি বড় সমস্যা। যে সকল ধানের বীজে সুপ্তিকাল কম তাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরও প্রকট। বিশেষত বর্ষা মৌসুমে কর্তনের সময় বীজ ভিজে গেলে এটি আশংকাজনক অবস্থায় পৌছায়। সাধারণভাবে বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায় এবং উপকূলীয় এলাকার কৃষকগণ প্রতি বছর এ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এমতাবস্থায়, কৃষক কর্তৃক উপযুক্ত শস্য বীজ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিনা ও অন্যান্য সহযোগী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কৃষক পর্যায়ে উপযুক্ত ধানের বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তির ওপর গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, ধান ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে (১২% থেকে ১৪% আর্দ্রতায়) টিন, পাস্টিক অথবা মাটির তৈরি মটকার উভয় পার্শ্বে এনামেল পেইন্ট দিয়ে ভাল ও সুস্থ ধানের বীজ ৬-৮ মাস সংরক্ষণ করা যায়। এতে অংকুরোদগম ক্ষমতা প্রায় ৮৭% থাকে। উল্লেখ্য যে, বীজ সংরক্ষণের পাত্রটি বায়ু নিরোধক অবস্থায় রাখা প্রয়োজন এবং পাত্রটিতে বীজ রাখার পর ফাঁকা স্থান অন্য কিছু দিয়ে ভরে রাখা প্রয়োজন। এতে করে কীটপতঙ্গের প্রজনন বৃদ্ধি ও আক্রমণ থেকে বীজকে রক্ষা করা যাবে। তাছাড়া নিমপাতা শুকিয়ে অথবা নিম তৈল বীজের সাথে মিশিয়েও বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

গম

গমে প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ প্রোটিন থাকে। খাবার জন্যে ব্যবহৃত মোট উৎপাদিত শস্যের মধ্যে গম রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে। বিনা হতে এ পর্যন্ত একটি গমের জাত ছাড় করা হয়েছে।

বিনাগম-১

বিনাগম-১ এর মিউট্যান্ট সারি নং L-880-43। পাকিস্তানের Nuclear Institute for Agriculture and Biology (NIAB) থেকে L-880 নামক একটি Segregating মিউট্যান্ট সংগ্রহ করে জন্মানো গাছগুলোর প্রতিটি থেকে সবচেয়ে ভাল শীষগুলো বাছাই করে পরবর্তি বছর প্রত্যেকটি শীষ থেকে প্রাপ্ত বীজগুলো আলাদা আলাদা সারিতে বপন করা হয় এবং চেক জাতের চেয়ে বেশি ফলন দিতে সক্ষম এরকম ১৮টি সারি নির্বাচন করা হয়। এ ১৮টি সারি পরবর্তিতে মাঠ পর্যায়ে লবণাক্ত এবং অলবণাক্ত উভয় মাটিতে পরীক্ষা করে ৩টি মিউট্যান্ট সারি নির্বাচন করা হয়। সবশেষে উক্ত ৩টি মিউট্যান্টের মধ্যে L-880-43 মিউট্যান্টটি লবণাক্ত এবং অলবণাক্ত এলাকার গবেষণা মাঠ ও কৃষক মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এ মিউট্যান্টটি অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায় থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ১২ ডিএস/মি লবণাক্ততায়ও চেক জাত বারিগম-২৫ অপেক্ষা ১০-১৫% বেশি ফলন দিতে সক্ষম বিধায় ২০১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০তম সভায় এটিকে বাংলাদেশের লবণাক্ত ও অলবণাক্ত এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়।

লবণাক্ত মাটিতে পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৬৭-৯০ সে.মি. এবং অলবণাক্ত মাটিতে পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৮-১০৪ সে.মি.। এর জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। ১০০০ দানার ওজন ৩৬.৬ গ্রাম। শীষে দানাগুলো ঘনভাবে সজ্জিত এবং দানার সংখ্যা ৪৮-৫৬টি।

মাঠে বিনাগম-১

বিনাগম-১ এর বীজ

লবণাক্ত মাটিতে ফলন ২.২-৩.৫ টন/হেক্টর ও গড়ে ২.৯ টন/হেক্টর এবং অলবণাক্ত মাটিতে ফলন ৩.২-৪.২ টন/হেক্টর ও গড়ে ৩.৮টন/হেক্টর।

বিশেষগুণ

পিআই স্টেজে এর অরিকল গোলাপী রংয়ের এবং গাছের কান্ড, পাতা ও শীষ মোমের আস্তরণযুক্ত। দানা মাঝারী ও বাদামী (Amber) রংয়ের।

গমের উৎপাদন প্রযুক্তি

বপনের সময়

এ জাতের বীজ অঞ্চলভেদে নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ থেকে ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহ (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ৩য় সপ্তাহ) পর্যন্ত বপন করা যায়। জমিতে বীজ বপনের সময় মাটির লবণাক্ততা ৫ ডিএস/মি এর অধিক না হওয়া ভাল।

বীজের পরিমাণ

গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশি হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি (শতাংশে ৫০০ গ্রাম) বীজ ব্যবহার করতে হবে।

বীজ শোধন

বপনের পূর্বে প্রোভ্যাক্স-২০০ নামক ছত্রাকনাশক (প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। এতে বীজবাহিত রোগ দমন হয় এবং শতকরা ১০-১২ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায়।

বপন পদ্ধতি

বীজ ছিটিয়ে অথবা সারিতে বপন করা যায়। তবে সারিতে বপন করা উত্তম। ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালভাবে তৈরি করে ৮ ইঞ্চি (২০ সে.মি.) দূরে দূরে সারিতে ৪-৫ সে.মি. গভীরে বীজ বপন করতে হবে। সারির মধ্যে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২ ইঞ্চি (৫ সে.মি.) রাখতে হবে। আমন ধান কাটার পর জমিতে 'জো' আসলে পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে একচাষে সারিতে বীজ বপন করা যায়।

সার প্রয়োগ

লবণাক্ত মাটিতে প্রতি হেক্টরে ২২০-২৬০ কেজি ইউরিয়া, ১২৫-১৫০ কেজি টিএসপি, ১২০-১৪০ কেজি এমওপি, ৬৫-৮৫ কেজি জিপসাম, ৬.০ কেজি করে জিঙ্ক সালফেট ও বরিক এসিড এবং অলবণাক্ত মাটিতে প্রতি হেক্টরে ৪০ কেজি ইউরিয়া ও ২০ কেজি এমওপি বাড়িয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সারের অর্ধেকসহ সমস্ত রাসায়নিক সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া সার বপনের ২০-২৫ দিন পরে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও প্রতি হেক্টর জমিতে ৫.০ টন হারে পঁচা গোবর সার/কম্পোস্ট ব্যবহার করা ভাল। গোবর সার/কম্পোস্ট ব্যবহার করলে গোবর সারে যে পরিমাণ বিভিন্ন খাদ্য উপাদান থাকে তা হিসাব করে সে অনুযায়ী রাসায়নিক সারের পরিমাণ কমিয়ে ব্যবহার করতে হবে। গোবর সার জমি তৈরির ২ সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করতে হবে। মাটির অম্লীয় মান (pH) ৫.৫ এর কম হলে হেক্টর প্রতি ১০০০ কেজি (শতাংশে ৪ কেজি) হারে ডলোচুন বীজ বপনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে। তিন বছর পর পর মাটির অম্লীয় মান পরীক্ষাপূর্বক জমিতে ডলোচুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেচ প্রয়োগ

মাটির প্রকারভেদে গম আবাদে ২-৩ টি সেচের প্রয়োজন হয়। বৃদ্ধি পর্যায়ে ৮০ মি.মি. বা তার চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হলে কোন সম্পূরক সেচ না দিলেও চলে। বৃষ্টিপাত ৮০ মি.মি. এর চেয়ে কম হলে বা সময়মত না হলে ২টি সেচ দিতে হবে প্রথমটি বপনের ২১-২৫ দিন পরে ও অপরটি ফুল আসা শুরু হলে।

অন্যান্য পরিচর্যা

বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়াতে হবে। প্রথম সেচের পর জমিতে 'জো' আসলে আগাছা দমনের জন্য নিড়ানী দিতে হবে। চওড়া পাতা জাতীয় আগাছা (যেমন- বথুয়া, কাঁকরি, বিষকাটালী ইত্যাদি) দমনের জন্য বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ২৫ গ্রাম এফিনিটি পাউডার (আগাছানাশক) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ৫ শতাংশ জমিতে একবার প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ হলে ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিংক ফসফাইড বা ল্যানির‍্যাট) দিয়ে দমন করতে হবে। বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদনের জন্য গমের শীষ বের হওয়া থেকে শুরু করে পাকা পর্যন্ত রোগিং করতে হবে।

রোগ-বালাই দমন

দেরিতে বপনকৃত গম ক্ষেতে পাতার দাগ রোগ দমনের জন্য শীষ বের হওয়ার সময় ৫ মিলি টিল্ট ২৫০ ইসি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে। যখন বাতাসের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে তখন জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে যেকোন স্পর্শ বিষ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ব্লাষ্ট

গমের ব্লাষ্ট রোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে গমের শীষ বের হওয়ার সময় ১ম বার এবং ১০-১২ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৬ গ্রাম ছত্রাকনাশক ট্রুপার (টেবুকোনাজল ৫০% + ট্রাইফোক্সিস্ট্রোবিন ২৫%) ১০ লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এটি স্প্রে করলে গমের ব্লাষ্ট রোগ ছাড়াও পাতা ঝলসানো রোগ, বীজের কালো দাগ রোগ, মরিচা রোগ ইত্যাদি দমন হবে।

ফসল সংগ্রহ

গম গাছ সম্পূর্ণ পেকে হালকা হলুদ বর্ণ ধারন করলে তা সংগ্রহের উপযোগী হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সকালে কেটে দুপুরে মাড়াই করা উত্তম। মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই গম মাড়াই করা যায়। মাড়াইয়ের পর ১২ ভাগ বা তার কম আর্দ্রতা আসা পর্যন্ত গম রৌদে শুকাতে হবে। দানা দাঁতের নিচে চাপ দিলে কট করে শব্দ হলে বুঝতে হবে বীজের আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। শুকানোর পর বীজ ঠান্ডা ও পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ

কেরোসিন/ বিস্কুট টিন, ধাতব বা প্লাষ্টিকের ড্রাম, পলিথিন ব্যাগ, ইত্যাদি গমবীজ সংরক্ষণের জন্য উত্তম। বীজ সংরক্ষণের জন্য পাত্রটি পরিষ্কার, শুকনো, বায়ুরোধী ও ছিদ্রমুক্ত হতে হবে। বীজ দ্বারা পাত্র ভর্তি করতে হবে যাতে পাত্রের ভিতরে কোনো ফাঁকা জায়গা না থাকে। পাত্র ভর্তি না হলে শুকনো পরিস্কার বালি দ্বারা ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করে ভালেভাবে ঢাকনা আটকিয়ে মাঁচা বা কাঠের পাটাতনের উপর রাখতে হবে।

পাট

পাট একটি বর্ষাকালীন ফসল। বাংলাদেশে পাটকে সোনালী আঁশ বলা হয়ে থাকে এবং পাটই বাংলার (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের) শত বর্ষের ঐতিহ্য। দুই ধরনের পাট বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়: *Corchorus capsularis* (সাদা পাট) ও *Corchorus olitorius* (তোষা পাট)। এটি Tiliaceae পরিবারের অন্তর্গত একটি উদ্ভিদ। মনে করা হয় সংস্কৃত শব্দ পট্ট থেকে পাট শব্দের উদ্ভব হয়েছে। পাট বর্ষজীবী, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। গাছ ১.৪-৪.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ভ্যাপসা গরম (৩০-৩৭°সে) আর্দ্র আবহাওয়ায় পাট ভাল জন্মে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এই ফসলের উপর গবেষণা করে এ পর্যন্ত ২টি উচ্চ ফলনশীল জাত এটমপাট-৩৮ এবং বিনাদেশীপাট-২ উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া শাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিনাপাটশাক-১ নামে একটি জাত উদ্ভাবন করেছে। জাত তিনটির বৈশিষ্ট্য এবং চাষ পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হলো।

এটমপাট-৩৮

ডি-১৫৪ জাতের বীজে গামা-রশ্মি প্রয়োগ করে এর বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল এটমপাট-৩৮ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ১৯৮৮ সনে এ জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

মাঠে এটমপাট-৩৮

এটমপাট-৩৮ এর বীজ

বিনাদেশীপাট-২

দেশী পাট সাধারণত মার্চের ১৫ তারিখের পূর্বে বপন করলে আগাম ফুল আসে, ফলে গাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং ফলনও আশানুরুপ পাওয়া যায় না। বর্তমানে পাটকে কাগজের মন্ড তৈরিতে ব্যবহার করতে আগাম বপন উপযোগী জাতের প্রয়োজন।

মাঠে বিনাদেশীপাট-২

বিনাদেশীপাট-২ এর বীজ

এ সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্দেশ্যে সিভিএল-১ জাতের বীজে সোডিয়াম অ্যাজাইড নামক রাসায়নিক মিউটাজেন প্রয়োগ করে এর বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তনের মাধ্যমে আংশিক আলোক অসংবেদনশীল এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা অন্যান্য জাতের চেয়ে ১৫ দিন পূর্বে বপন করা যায়। এ জাতটি বিনাদেশীপাট-২ নামে ১৯৯৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

এটমপাট-৩৮ এবং বিনাদেশীপাট-২ এর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	এটমপাট-৩৮	বিনাদেশীপাট-২
বপনের সময়	ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহ হতে চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ	ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহ হতে চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ
হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	২.৮-২.৯	৩.৩-৩.৫
ফলন বৃদ্ধির হার	ডি-১৫৪ থেকে ১২-১৫% বেশি সিভিএল-১ এর চেয়ে ৮% বেশি	ডি-১৫৪ থেকে ২০-২৫% বেশি
গাছের উচ্চতা (সেমি)	২৮০-৩২৫	৩০০-৩৫০
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা	অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি	অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি
জাত সনাক্ত করার চিহ্ন	পাতার দুপার্শ্বের স্টিপিউলগুলো পাতায় রূপান্তরিত হয়েছে	গাছের কান্ড হালকা সবুজ
জলমগ্ন অবস্থায় অস্থানিক মূল	বিলম্বে বের হয়	বিলম্বে বের হয়
নাইট্রোজেন ব্যবহার ক্ষমতা	অন্যান্য জাতের মতই	অন্যান্য জাতের চেয়ে বেশি

পাটের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

পলি দো-আঁশ মাটি সবচাইতে উপযোগী। এঁটেল থেকে শুরু করে বেলে দো-আঁশ মাটিতেও পাট চাষ করা যায়। যে জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এবং আষাঢ় মাসের পূর্বে বন্যার পানি আসে না এ ধরনের সকল জমিই এটমপাট-৩৮ এবং বিনাদেশীপাট-২ চাষাবাদের জন্য উপযোগী।

জমি তৈরী

পাঁচ/ছয়টি চাষ ও মই দিয়ে জমি উত্তমভাবে প্রস্তুত করতে হয়। মিহি মাটি পাট বীজ বপনের জন্য উত্তম।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

একর প্রতি ২ টন (আনুমানিক ৫০ মণ) গোবর সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করা খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া জমি তৈরির সময় নিম্ন উল্লেখিত পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। গোবর সার দিলে নিম্ন সারের পরিমাণ অর্ধেক প্রয়োজন হবে।

সারের নাম	হেক্টর প্রতি (কেজি)	একর প্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	১৭৫-২২৫	৪০-৮০
টিএসপি	৮০-১০০	২৮-৩৬
এমওপি	৮০-১২০	৩২-৪৮
জিপসাম	৬০-৭৫	২০-২৪

বীজ বোনার ৬ সপ্তাহ পরে একর প্রতি আরও ১৫ কেজি ইউরিয়া সার লাইনের মধ্যবর্তী জায়গায় ছিটিয়ে দিতে হবে এবং ছিটানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে সার গাছের পাতায় না পড়ে।

বীজ বপনের সময়

এটমপাট-৩৮: ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ হতে চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। এ সময়ের মধ্যে বীজ বপন করলে অপেক্ষাকৃত বেশি ফলন পাওয়া যায়।

বিনাদেশীপাট-২: ফাল্গুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের পরিমাণ

লাইন পদ্ধতিতে একর প্রতি ৩ কেজি বীজ বপন করতে হয়। ছিটিয়ে বপন করতে হলে একরে ৪ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বপনের পদ্ধতি

পাটের বীজ লাইনে বুনলে ভাল হয় ও গাছের পরিচর্যায় সুবিধা হয় এবং উৎপাদন খরচও কম হয়। লাইন হতে লাইনের দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছ হতে গাছের দূরত্ব ৫-৭ সেমি হলে ভাল হয়। সাধারণত লাইনে বীজ বপনের সময় একটু ঘন করেই দিতে হয়। পরে নিড়ানী দিয়ে (দু'বারে) গাছ হতে গাছের দূরত্ব রক্ষা করতে হয়। বীজ লাইনে দেয়ার পর মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

শস্যপর্যায় অবলম্বন করে, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলে, শোধিত বীজ বপন করে ও জমির উত্তম ব্যবস্থাপনা দ্বারা রোগ অনেকাংশে দমন করা সম্ভব। রোগের আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে এমন অবস্থায় ছিটানো ঔষধ ব্যবহার করা প্রয়োজন। পোকা দমনের জন্যেও উপরিউক্ত ব্যবস্থা প্রযোজ্য। বিছা পোকা দমনের জন্য বিছা পোকার ক্রিড়াগুলি যে পাতায় দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে সে পাতাটি সংগ্রহ করে পায়ের সাহায্যে মাড়িয়ে ফেলতে হবে। সাদা ও লাল মাকড়ের আক্রমণে পাটের আঁশ উৎপাদনের ক্ষমতা অনেকাংশে কমে যায়। এটমপাট-৩৮ ও বিনাদেশীপাট-২ জাত দু'টি কান্ড পঁচা রোগ ও চেলে পোকার আক্রমণ অনেকাংশে সহণশীল। লাল ও সাদা মাকড় দমনের জন্য থিওভিট ৮০% পাউডার প্রতি ১ লিটার পানিতে ১০.৫ গ্রাম বা ডাইমিথয়েট ৪০ ইসি ১০ লিটার পানিতে ২০ মিলি মিশিয়ে প্রতি পাঁচ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। কান্ড পঁচা রোগের জন্য ডায়থেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ৪.৫ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া প্রতি কেজি বীজ ৫ গ্রাম প্রোভ্যাক্স/ অটাস্টিন/ নোরিন দ্বারা শোধন করতে হবে।

পাট কাটা ও জাগ দেয়া

ফুল আসার দুই সপ্তাহের মধ্যে পাট কেটে পানিতে জাগ দিলে আঁশের ফলন ও মান ভাল হয়। জাগ পদ্ধতির উপর আঁশের মান অনেকাংশে নির্ভর করে। জাগের উপর কাদামাটি ব্যবহার তথা অপরিষ্কার ও বদ্ধ পানিতে পাট পঁচালে আঁশ খুবই নিম্নমানের হয়। পাট পঁচানোর পর হাত দিয়ে পাট খড়ি থেকে আঁশ ছাড়িয়ে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ভালভাবে ধুয়ে কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা যেতে পারে।

বিনাপাটশাক-১

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর বিজ্ঞানীগণ উন্নতমানের পাট পাতার নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য পরমাণু শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীজাত সিভিএল-১ এর বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে, বেশি পাতা বিশিষ্ট একটি নতুন লাইন (সি এম-১৮) উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন এলাকায় উক্ত মিউট্যান্ট লাইনটির ফলন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে মাতৃজাত থেকে ২৫-৩০% পাতার ফলন বেশি। এছাড়া জাতটিতে আমিষ ৫.৯%, আঁশ ১.২%, অ্যালকালয়েড ০.১৫%, ভিটামিন সি (প্রতি ১০০ গ্রামে ২১.৬%) এবং প্রচুর ক্যারোটিন (প্রতি ১০০ গ্রামে ভিটামিন এ ১০,৭০০ মাইক্রন) বিদ্যমান। এসব দিক বিবেচনা করে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০০৩ সালে মিউট্যান্টটিকে পাটশাক হিসেবে সারা বাংলাদেশে চাষের জন্য বিনাপাটশাক-১ নামে নিবন্ধন করা হয়।

মাঠে বিনাপাটশাক-১

বিনাপাটশাক-১ এর বীজ

এ জাতটি থেকে কোন প্রকার আঁশ পাওয়া যাবে না। গাছ খুবই খাটো। অন্যান্য জাতের চেয়ে পাতার সংখ্যা ও আয়তন বেশি। পাতা দেখতে গাঢ় সবুজ ও সতেজ, ফলে বাজারে চাহিদা বেশি। পাটশাকের ফলন প্রায় ৩.৫ টন/হেক্টর যা অন্যান্য জাতের চেয়ে প্রায় ২৫-৩০% বেশি।

চাষাবাদ পদ্ধতি

জমি নির্বাচন

পলি দো-আঁশ মাটি সবচাইতে বেশি উপযোগী তবে এঁটেল থেকে বেলে দো-আঁশ মাটিতেও পাটশাক চাষ করা যায়। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায় পাটশাক চাষ করা যায়। জমি তৈরির সময় আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

জমি তৈরি

পাটশাকের জন্য জমি ৫/৬টি চাষ দিয়ে মাটি গুঁড়া করে বীজ বপন করতে হবে। মিহি মাটি বীজ বপনের জন্য উত্তম।

বপনের সময়
ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি
হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন গোবর সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করা খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া বীজ বোনার সময় নিম্ন পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে:

সারের নাম	*হেক্টর প্রতি (কেজি)*	*একর প্রতি (কেজি)*
ইউরিয়া	৩০-৩৫	১২-২০
টিএসপি	২৫-৫০	১০-২০
এমওপি	৩০-৪০	১২-১৬

প্রথমবার শাক উত্তোলনের পরে পরবর্তীতে শাক পেতে হলে অবশিষ্ট গাছের জন্য একমাস অন্তর অন্তর হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ৩০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ইউরিয়া ছিটানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন সার গাছের পাতার সাথে লেগে না থাকে। তবে সার প্রয়োগের পর ৭-১০ দিন পর্যন্ত শাক খাওয়া থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। সারের মাত্রা মাটির প্রকার, এলাকা ভেদে ভিন্ন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে থানা নির্দেশিকা বা জাতীয় সার নির্দেশিকার মাত্রা অনুসরণ করা যেতে পারে।

বীজের পরিমাণ
সারি পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ১৪ কেজি এবং ছিটিয়ে বপন করলে ১৫ কেজি (প্রতি শতকে ৬০ গ্রাম) বীজ দিতে হবে। সারি পদ্ধতিতে বপন করলে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

রোগ ও পোকামাকড় দমন
সাধারণত বিনাপাটশাক-১ এ কোন রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা যায় না। পাটশাকে কোন প্রকার বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়।

পাটশাক সংগ্রহ
পাট গাছের উচ্চতা ১৫-২০ সেমি হলে তখন থেকেই শাক খাওয়া যায়। প্রথমে গাছ তুলে এবং পরবর্তীতে গাছের সংখ্যা কমে গেলে গাছের ডগা ছিঁড়ে শাক খাওয়া যেতে পারে। ডগা তোলার কিছুদিন পর নতুন শাখা থেকে কচি পাতা বের হলে এগুলোও শাক হিসেবে খাওয়া যাবে। এভাবে অনেকবার শাক সংগ্রহ করা সম্ভব। বিনাপাটশাক-১ একবার চাষ করে দীর্ঘ কয়েক মাস (মার্চ থেকে আগষ্ট) পর্যন্ত শাকের অভাব পূরণ করা যায়।

বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল
বীজ উৎপাদনের জন্য কোন নতুন কৌশলের প্রয়োজন পড়ে না। যেহেতু এটা স্ব-পরাগায়িত ফসল, সেহেতু বীজ উৎপাদন কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। স্বাভাবিক বপন সময়ে বীজ বপন করে বীজ উৎপাদন সম্ভব। তবে এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত একটু উঁচু জমিতে বীজ বপন করলে ভাল বীজ পাওয়া যায়। বীজ ভালভাবে সংরক্ষণ করলে ২-৩ বছর এ বীজ ব্যবহার করা যায়।

তেল ফসল

সরিষা

আমাদের দেশে তেলবীজ ফসল হিসেবে সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী, তিসি, গর্জনতিল ও কুসুমফুলের চাষাবাদ করা হয়। এর মধ্যে ভোজ্যতেল হিসেবে প্রধানত সরিষা আবাদ করা হয়। সরিষা ক্রুসিফেরি (বর্তমান নাম Brassicaceae) পরিবারের অন্তর্গত, দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। সরিষার তেলে ৪০-৪৫% তেল এবং ২০-২৫% প্রোটিন থাকে। সরিষার খৈল উত্তম পশুখাদ্য এবং জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ দেশের তেলবীজ আবাদি জমির প্রায় ৭৮% এলাকায় সরিষা চাষ হয়ে থাকে। বিনা হতে এ পর্যন্ত সরিষার ১০টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিনা উদ্ভাবিত ১০টি জাতের মধ্যে সফল, অগ্রণী এবং বিনাসরিষা-৬ *Brassica rapa* L. var: yellow sarson; বিনাসরিষা-৩, বিনাসরিষা-৪, বিনাসরিষা-৫ ও বিনাসরিষা-৯ *Brassica napus* L.; বিনাসরিষা-৭ ও বিনাসরিষা-৮ *Brassica juncea* L. Green and coss এবং বিনাসরিষা-১০ *Brassica rapa* L. var. Toria প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত।

সফল এবং অগ্রণী

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯০ সালে অধিক ফলনশীল সরিষা'র জাত 'সফল' এবং 'অগ্রণী' উদ্ভাবন করে। ১৯৯১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাত দুটি কৃষক পর্যায়ে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়। জাত দুটির কান্ড মোটা ও শক্ত, ফলে সহজে মাটিতে ঢলে পড়ে না। গাছের শুকনো কান্ড থেকে বেশি খড়ি পাওয়া যায় যা কৃষকগণ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

মাঠে সফল সরিষা ইনসেটে বীজ

মাঠে অগ্রণী সরিষা ইনসেটে বীজ

বিনাসরিষা-৩

নেপাস প্রজাতির সরিষা (ন্যাপ-৩) বীজে বিভিন্ন মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ৭০০ গ্রে মাত্রা থেকে একটি স্বল্প জীবনকালের উন্নত মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯৭ সনে

জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক উক্ত মিউট্যান্টটিকে ‘বিনাসরিষা-৩’ নামে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়। জাতটি স্বপরাগায়িত বিধায় এর বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করা সহজ।

অধিক ফলন প্রদান করা ছাড়াও এটি ভারী বৃষ্টিজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা তুলনামূলকভাবে বেশি সহ্য করতে পারে। ফল আকারে মোটা ও লম্বা, তাই ফলের মধ্যে অধিক সংখ্যক বীজ থাকে এবং বীজের আকারও বড়।

মাঠে বিনাসরিষা-৩ ইনসেটে বীজ

বিনাসরিষা-৪

সরিষার লাইন ন্যাপ-৩ এর বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ৭০০ গ্রে মাত্রা থেকে একটি স্বল্প জীবনকালের উন্নত মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক উক্ত মিউট্যান্টটিকে ‘বিনাসরিষা-৪’ নামে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

জাতটি স্বপরাগায়িত বিধায় এর বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করা সহজ। অধিক ফলন প্রদান করা ছাড়াও এটি ভারী বৃষ্টিজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা তুলনামূলক ভাবে বেশি সহ্য করতে পারে এবং পাতা ও ফলের অল্টারনেরিয়া ব্লাইট বা পাতা ঝলসানো রোগ প্রতিরোধী। ফল আকারে মোটা ও লম্বা, তাই ফলের মধ্যে অধিক সংখ্যক বীজ থাকে এবং বীজের আকারও বড়। জাতটি দেরীতে বপন করলেও (ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ) ভাল ফলন পাওয়া যায়। জাতটি ৬-৮ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল।

মাঠে বিনাসরিষা-৪ ইনসেটে বীজ

বিনাসরিষা-৫

বিদেশী ও স্থানীয় সরিষা বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে লবণ সহিষ্ণু মিউট্যান্ট লাইন এমএম২০ সনাক্ত করা হয় এবং ২০০২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনাসরিষা-৫ নামে লবণাক্ত এলাকায় চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়। জাতটি লবণ সহিষ্ণু (লবনাক্ততা সহ্যক্ষমতা ৪-৬ ডিএস/মি.) বিধায় বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আবাদ করে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

মাঠে বিনাসরিষা-৫ ইনসেটে বীজ

বিনাসরিষা-৬

স্থানীয় জাতের সরিষা ওয়াইএস-৫২ এর বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি লবণ সহিষ্ণু মিউট্যান্ট লাইন সনাক্ত করা হয়। মিউট্যান্ট লাইনটি ২০০২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনাসরিষা-৬ নামে লবণাক্ত এলাকায় চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

মাঠে বিনাসরিষা-৬ ইনসেটে বীজ

বিনাসরিষা-৭

বারিসরিষা-১১ জাতের বীজে ৭০০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে বিনাসরিষা-৭ উদ্ভাবন করা হয়, যা ২০১১ সালে জাত হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। এই জাতের সরিষার গাছ লম্বা, ফলের সংখ্যা বেশি। এই জাত সারা বাংলাদেশে চাষ করা সম্ভব। জাতটি পাতা ও ফলের অল্টারনেরিয়া ব্লাইট বা পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল। জাতটি ৬-৮ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল।

মাঠে বিনাসরিষা-৭

বিনাসরিষা-৭ এর বীজ

বিনাসরিষা-৮

বারিসরিষা ১১ জাতের বীজে ৭০০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে বিনাসরিষা-৮ উদ্ভাবন করা হয়, যা ২০১১ সালে জাত হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। এই জাতের গাছ খাটো আকৃতির, ফলগুলো রেকিসের সাথে লেগে থাকে। সারা দেশে এই জাত চাষ করা সম্ভব। জাতটি ৬-৮ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল।

মাঠে বিনাসরিষা-৮

বিনাসরিষা-৮ এর বীজ

বিনাসরিষা-৯

বিনাসরিষা-৪ জাতের বীজে গামারশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচনে দেখা যায় যে, এমএম-৫১ মিউট্যান্টটি মাতৃ জাত বিনাসরিষা-৪ এর তুলনায় জীবনকাল কম ও ফলন ভালো। জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৩ সালে এমএম-৫১ মিউট্যান্টটিকে নতুন জাত 'বিনাসরিষা-৯' হিসেবে নিবন্ধন করে।

বিনাসরিষা-৯ এর মাতৃজাত বিনাসরিষা-৪ হতে উচ্চতায় খাটো ও জীবনকাল প্রায় এক সপ্তাহ কম এবং উচ্চ ফলনশীল। তাছাড়া জাতটি পাতা ও ফলের অল্টারনেরিয়া ব্লাইট বা পাতার দাগ পড়া রোগ ও ভারী বৃষ্টিজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল। জাতটি দেরিতে বপন করলেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। জাতটি ৬-৮ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল।

মাঠে বিনাসরিষা-৯

বিনাসরিষা-৯ এর বীজ

বিনাসরিষা-১০

বিনাসরিষা-৪ এবং টরি-৭ জাত দু'টির মধ্যে সংকরায়ন করে পরবর্তীতে সপ্তম প্রজন্মে গবেষণা খামার এবং সরিষা চাষাধীন এলাকায় কৃষকের জমিতে ফলন পরীক্ষা ও মূল্যায়ণের মাধ্যমে আরসি-৫ লাইনটিকে ফলন এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উন্নত হওয়ায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

মাঠে বিনাসরিষা-১০

বিনাসরিষা-১০ এর বীজ

উন্নত বৈশিষ্ট্যের কারণে ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড আরসি-৫ লাইনটিকে 'বিনাসরিষা-১০' নামে সারাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করে। বিনাসরিষা-১০ জাতটি খাটো এবং টরি টাইপের। জাতটির বীজের আকার টরি-৭ হতে বড়, জীবনকাল কম ও উচ্চ ফলনশীল।

সারণী-২. বিনা উদ্ভাবিত সরিষার জাতগুলোর অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম									
	সফল	অগ্রণী	বিনাসরিষা-৩	বিনাসরিষা-৪	বিনাসরিষা-৫	বিনাসরিষা-৬	বিনাসরিষা-৭	বিনাসরিষা-৮	বিনাসরিষা-৯	বিনাসরিষা-১০
গাছের উচ্চতা (সেমি)	১৫০-১৮০	১৪০-১৬০	৯৫-১০৫	৮৫-৯৫	৯০-১০০	১৩০-১৫০	১৫৫-১৭০	১২০-১৪০	৮৫-৯০	৯৫-১০৫
জীবনকাল (দিন)	৯০-৯৫	৮৫-৯০	৮৫-৮৮	৮৫-৮৮	৮৫-৯০	৯০-৯৫	১০২-১১০	১০০-১০৮	৮০-৮৪	৭৮-৮২
বীজের রঙ	হলুদ	হলুদ	লালচে-কাল	লালচে-কাল	লালচে-বাদামি	হাল্কা হলুদ	কালচে	কালচে	লালচে-কাল	লালচে-কাল
ফলন সর্বোচ্চ (টন/হেক্টর)	২.০০	২.০০	২.৪০	২.৪০	২.১০	২.২০	২.৮০	২.৪০	২.০০	১.৭০
গড় ফলন (টন/হেক্টর)	১.৭৫	১.৭৫	১.৮০	১.৮০	১.৪০	১.৩০	২.০০	১.৯০	১.৭০	১.৫০
বীজে তেলের পরিমাণ (%)	৪৩	৪৪	৪৪	৪৪	৪৩	৪৪	৪০	৩৯	৪৩	৪২

সরিষার উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

বিনা উদ্ভাবিত সরিষার জাতগুলো এঁটেল দো-আঁশ, দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

জমি তৈরি

সরিষা চাষের জন্য জমি সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাটির প্রকারভেদে ৪-৬ বার আড়াআড়িভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এ সময় জমি থেকে সকল ধরনের আগাছা ফেলে দিতে হবে। শেষবার চাষের পর মই দিয়ে উপরিস্তরের মাটি ভালভাবে আঁটসাঁট করে দিতে হবে যেন জমির রস দ্রুত চলে না যায়। উল্লেখ্য যে, বীজ বপনের সময় পর্যন্ত জমিতে পরিমিত রস থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বীজ বপনকাল

সঠিক সময়ের পূর্বে বা পরে বীজ বপন করলে ফলন কমে যায়। সাধারণত অক্টোবর মাসের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। তবে বিনাসরিষা-৪, বিনাসরিষা-৭, বিনাসরিষা-৮ এবং বিনাসরিষা-৯ নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যায়।

বীজ হার

সরিষার বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। তবে সারি করে বুনলে সার ও সেচ প্রয়োগ এবং নিড়ানী দিতে সুবিধা হয়। সারি হতে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সে.মি. রাখতে হবে। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি বীজের হার ৭.৫ কেজি (একর প্রতি ২.৮-৩.০ কেজি)। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে বীজের হার অপেক্ষাকৃত কম লাগে, হেক্টর প্রতি ৬.০ কেজি (একর প্রতি ২.২-২.৫ কেজি)। তবে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা কম হলে বা জমিতে রসের ঘাটতি হলে, বীজের হার বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনের অধিক হারে বীজ বপন করলে বা জমিতে অধিক সংখ্যক গাছ জন্মালে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না, ফল কম ধরে ও ফলন হ্রাস পায়।

বীজ শোধন

অল্টারনেরিয়া ব্লাইট সরিষার প্রধান রোগ যা বীজবাহিত। প্রতি কেজি বীজে ২-৩ গ্রাম প্রোভ্যাক্স-২০০ ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে লাগালে এই রোগটি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

বীজ বপন পদ্ধতি

রসালো মাটিতে বীজ অর্ধ সে.মি. গভীরে, অপেক্ষাকৃত কম রসালো জমিতে একটু গভীরে, তবে সর্বাধিক তিন সে.মি. গভীর পর্যন্ত বীজ ফেলা যেতে পারে। এর অধিক গভীরে বীজ ফেলা হলে, চারা ও গাছ দুর্বল হয় এবং ফলন কমে যায়। সারি এবং ছিটিয়ে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যেতে পারে। সারিতে বীজ বপন করা হলে মাটির রস সংরক্ষণ ও ফসল ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। সারি থেকে সারি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব দিতে হবে যথাক্রমে ২৫-৩০ সে.মি. ও ৩-৫ সে.মি.। জমিতে পরিমিত সংখ্যক গাছ রাখার জন্য যদি পাতলা করার প্রয়োজন হয়, তবে তা অবশ্যই বীজ গজানোর পর দু'সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারণী-৩. বিনা উদ্ভাবিত সরিষা'র জাতগুলোতে একর প্রতি নিম্নলিখিত মাত্রায় বিভিন্ন সার প্রয়োগ করতে হবে ঃ

সার	সফল, অগ্রণী, বিনাসরিষা-৩, বিনাসরিষা-৪, বিনাসরিষা-৫, বিনাসরিষা-৭, বিনাসরিষা-৮ ও বিনাসরিষা-৯	বিনাসরিষা-৬ ও বিনাসরিষা-১০
ইউরিয়া	৮০-৯০ কেজি	৬০-৭০ কেজি
টিএসপি	৭০-৮০ কেজি	৫০-৬০ কেজি
এমওপি	৪৫-৫৫ কেজি	৩০-৩৫ কেজি
জিপসাম	৫০-৬০ কেজি	৫০-৬০ কেজি
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪ কেজি
বোরিক এসিড	৩ কেজি	২-৩ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সারের সম্পূর্ণ পরিমাণ শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট অর্ধেক ইউরিয়া চারা গজানোর ২৫ দিন পর অর্থাৎ ফুল ফোটার আগে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। পুষ্টমানের বীজ গঠনের জন্য বোরন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। তাই সরিষা চাষের জমিতে অবশ্যই বোরন সার দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে রস থাকা দরকার।

আগাছা দমন ও সরিষা পাতলাকরণ

সরিষা গাছ চারা অবস্থায় দ্রুত বাড়তে পারে না বিধায় আগাছা দ্রুত বেড়ে সরিষার চারা ঢেকে ফেলে এবং অধিক হারে জমি থেকে সার গ্রহণ করে। তাই জমি আগাছামুক্ত রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দিতে হবে। চারা গজানোর ১৫-২০ দিনের মধ্যে নিড়ানি দিয়ে অতিরিক্ত চারা ও আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

জমির শুষ্কতাভেদে সরিষার জমিতে ১-২ বার পানি সেচ দিয়ে অধিক ফলন পাওয়া যেতে পারে। তবে পানি সেচ দেয়ার বিষয়টি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। অধিক বৃষ্টিপাত হলে জমি থেকে পানি বের করে দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সাধারণত দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর ক্ষেত্রে দুই বার (বীজ গজানোর ২০-২৫ দিন পর প্রথমবার এবং ৪৫-৫০ দিন পর দ্বিতীয়বার) এবং ময়মনসিংহ জেলাসহ অন্যান্য স্থানের জন্য মাত্র একবার পানি সেচ দেয়ার সুপারিশ করা হয়। বীজ বপনকালীন জমি শুষ্ক হলে একটা হালকা সেচ দিয়ে বীজ বপন করা প্রয়োজন। নাইট্রোজেন সার সদ্ব্যবহারের জন্যও জমিতে রস থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সরিষা গাছ ফুলন্ত অবস্থা থেকে ফল পুষ্টকালীন সময় পর্যন্ত সর্বাধিক পানি গ্রহণ করে থাকে। এ সময়ে জমিতে রস থাকতে হবে। তবে ফল পুষ্ট হওয়ার পরে সরিষার ক্ষেতে পানি সেচ দিলে ফসলের জীবনকাল দীর্ঘায়িত হয়।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

অল্টারনেরিয়া ব্লাইট:

অল্টারনেরিয়া ব্লাইট রোগ সরিষা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় এই রোগের আক্রমণে ৩৫-৪৬% পর্যন্ত ফলন হ্রাস পেতে পারে। এটি একটি বীজবাহিত ছত্রাক রোগ। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগটির দ্রুত বিস্তার ঘটে। গাছের পাতা, কান্ড ও ফল অর্থাৎ গাছের সকল অংশেই এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে। আক্রান্ত পাতায় ক্ষুদ্র ও গাঢ় রঙের গোলাকার এককেন্দ্রিক ক্ষতের ন্যায় দাগ দেখা যায়। গাছের বয়স ২৫-৩০ দিন হলে এ রোগের আক্রমণ শুরু হয়। আক্রান্ত গাছের ফল কুঁচকে যায়, বীজ পুষ্ট হয় না এবং গাছের পাতা ঝরে পড়ে। রোগ সংক্রমণ হওয়া মাত্র রোভরাল-৫০WP শতকরা ০.২ ভাগ হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২-৩ গ্রাম) পানিতে মিশিয়ে ৮-১০ দিন পর পর ৩-৪ গাছে স্প্রে করে দিতে হবে।

স্ক্লেরোটিনিয়া রট বা হোয়াইট মোল্ড রোগ:

এটি মাটিবাহিত ছত্রাক রোগ। অনুকূল পরিবেশ অর্থাৎ আর্দ্র ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় এ রোগের কারণে মাটির সাথে লেগে থাকা কান্ডে এবং বাড়ন্ত গাছে ফুল ধরা হতে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত কান্ডের মাঝ বরাবর সাদা তুলার মত মাইসেলিয়াম দেখা যায়, ফলে আক্তান্ত স্থান পচে গাছ মারা যায়। রোগটি দমনের জন্য পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, বীজ শোধন (প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউপি) এবং জমিতে আক্রমণের শুরুতেই প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন-৫০ ডব্লিউপি অথবা নোইন-৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর গোড়াসহ সমস্ত গাছে ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

সরিষা জমিতে মাঝে মাঝে অরোবাংকি নামক এক ধরনের পরজীবী দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো সরিষা গাছের শিকড়ের সাহায্যে জমি থেকে সার, পানি ইত্যাদি গ্রহণ করে। ফলে আক্রান্ত সরিষা গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে অরোবাংকির আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এগুলো মাটির নিচে থাকে। সরিষা গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে গোছা গোছা হাল্কা বেগুনি রঙের ফুলের ছড়ার মত এই পরজীবীটি মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এদের ফলে অসংখ্য বীজ হয়, যা পরে জমির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাই সরিষার তুলনায় অন্যান্য প্রজাতির সরিষা গাছে অধিক হারে এ পরজীবীর আক্রমণ ঘটে। শিকড়সহ অরোবাংকি গাছ জমি থেকে তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলা বা পুড়ে ফেলাই এ পরজীবী নিয়ন্ত্রণের উত্তম পন্থা। শস্য পরিক্রমাও এক্ষেত্রে একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

সরিষা ফসলের আর একটি প্রধান শত্রু জাবপোকা। এই ক্ষুদ্র পোকার দেহ দেখতে কোমল ও নাশপাতির মত, রং হলুদ বা অনুজ্জ্বল সবুজ, কলোনিতে বাস করে এবং দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার করতে পারে। এরা গাছের নরম অংশ, যেমন ফুল ও কচিপাতা ও কান্ডের রস চুষে খায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়, পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করে কুঁকড়ে যায়, ফল ও বীজ পুষ্ট হয় না। এতে ফলন ৩৫-৭৩% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। এই পোকার আক্রমণ শনাক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানির সাথে ২ মিলিলিটার মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক ছিটানোর পর ৭-৮ দিন পর্যন্ত জমি হতে শাক-পাতা তুলে খাওয়া যাবে না। একটি বিষয় উলেখ্য যে, সকাল থেকে বিকাল ২-৩ ঘটিকার মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি মধু সংগ্রহের জন্য সরিষা জমিতে আসে যা পরাগায়ণে সাহায্য করে। তাই বিকালের দিকে সরিষা ক্ষেতে যখন মৌমাছির আনাগোনা থাকে না, তখন কীটনাশক ছিটানো উচিত।

ফসল কর্তন, মাড়াই এবং সংরক্ষণ

উপযুক্ত সময়ে ফসল কর্তনের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। যখন গাছের পাতার রং হলুদ, ফল নাড়াচাড়া করলে শব্দ হয়, তখন ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়। নেপাস প্রজাতির বিনাসরিষা-৩, বিনাসরিষা-৪, বিনাসরিষা-৫ ও বিনাসরিষা-৯ এর অধিকাংশ গাছ খড়ের রং ধারণ করলে এবং ৭০-৮০% ফল পেকে গেলে সকাল বেলা আর্দ্র আবহাওয়ায় ফসল কর্তন করতে হবে। তবে অন্যান্য জাতের ক্ষেত্রে ৮০-৯০% ফল পেকে খড়ের রঙ ধারণ করলে কর্তন করতে হবে। বিলম্বে কর্তন করলে ফল ফেটে বীজ ঝরে পড়তে পারে। কর্তিত ফসল ২-৩ দিন স্তূপ করে রেখে পরবর্তীতে রৌদ্রে শুকিয়ে মাড়াই করতে হবে। উল্লেখ্য যে, গাদা অবস্থায় ৩ দিনের বেশি থাকলে অংকুরোদগম ক্ষমতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। মাড়াই করার পর বীজ বিশেষ যত্নসহকারে শুকাতে হবে। মনে রাখতে হবে কড়া রোদে একটানা অনেকক্ষণ ধরে শুকালে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই প্রতিদিন ২-৩ ঘন্টা করে একটানা কয়েক দিন শুকাতে হবে। শীতকালে যখন রোদের তাপ কম থাকে তখন একটানা ৪-৫ ঘন্টা ধরে শুকালেও কোন ক্ষতি হয় না। বীজ সরাসরি সিমেন্টের তৈরি খোলায় না শুকিয়ে ত্রিপল বা চাটাইয়ের উপর শুকাতে হবে। বীজ এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে বীজের আর্দ্রতা ৮% এর বেশি না থাকে। শুকানোর পর বীজ ভালোভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে। বীজ রাখার জন্য পলিথিনের ব্যাগ, টিনের ড্রাম, আলকাতরা মাখা মাটির মটকা বা কলসী, বিস্কুটের টিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মোটা পলিথিনের ব্যাগে বীজ রেখে মুখ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে তা আবার একটি চটের বস্তায় ভরে রাখলে ভালো হয়। পলিথিনের ব্যাগ বা ধাতব পাত্রের মুখ ভালোভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে যেন ভিতরে বাতাস ঢুকতে না পারে। বীজ শুকানোর পর গরম অবস্থায় সংরক্ষণ না করে ঠান্ডা হলে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজের পাত্র অবশ্যই ঠান্ডা অথচ শুষ্ক জায়গায় রাখতে হবে এবং সরাসরি মেঝেতে না রেখে মাচা বা কাঠের উপর রাখতে হবে।

চীনাবাদাম

চীনাবাদাম C3 শ্রেণিভুক্ত একটি শুঁটি জাতীয় ফসল। তবে C4 ফসলের ন্যায় প্রখর সূর্যালোকেও চীনাবাদাম পাতায় অত্যন্ত উচ্চ হারে সালোকসংশেষণ প্রক্রিয়া ঘটে। তীব্র আলোর প্রতি চীনাবাদাম গাছের উপরিভাগ অধিক সংবেদনশীল। কম সূর্যালোকের কারণে গাছের উপরিভাগের পাতা পূর্ণ মাত্রায় সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না। অর্থাৎ প্রখর সূর্যালোকের সময়ই কেবল চীনাবাদাম উচ্চ হারে সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে। তাই চীনাবাদাম ফসল থেকে অধিক ফলন পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সূর্যালোক থাকা প্রয়োজন যাতে উচ্চ হারে সালোকসংশ্লেষণ ঘটতে পারে। বীজের অংকুরোদগম থেকে শুরু করে সকল প্রকার বৃদ্ধি ও বিকাশে তাপমাত্রা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অধিক তাপমাত্রায় বীজের আকার ছোট হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে দশটি উন্নত চীনাবাদামের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

বিনাচীনাবাদাম-১, বিনাচীনাবাদাম-২ ও বিনাচীনাবাদাম-৩

উন্নত জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত ঢাকা-১ (মাইজচর) জাতের বীজে প্রথমে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায়। যার নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৬ (Mut-6)।

বিনাচীনাবাদাম-১ বিনাচীনাবাদাম-২ বিনাচীনাবাদাম-৩

১৯৯৪ সালে এ মিউট্যান্ট/প্রজনন সারিটিকে আবার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে M6/20/42-M(2), M6/20/44-3 ও M6/20/62-4 এই তিনটি মিউট্যান্ট/প্রজনন সারি পাওয়া যায়। এই মিউট্যান্টগুলি মাতৃজাত ঢাকা-১ (মাইজচর) থেকে অনেক বেশি ফলন দেয় বলে এগুলিকে যথাক্রমে বিনাচীনাবাদাম-১, বিনাচীনাবাদাম-২ ও বিনাচীনাবাদাম-৩ নামে ২০০০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড সারাদেশের কৃষক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

সারণী: ১ বিনাচীনাবাদাম-১, বিনাচীনাবাদাম -২, ও বিনাচীনাবাদাম -৩ এই তিন জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	বিনাচীনাবাদাম-১	বিনাচীনাবাদাম-২	বিনাচীনাবাদাম-৩
গাছের উচ্চতা	গড়ে ৩২ সে.মি.	গড়ে ২৮ সে.মি.	গড়ে ৩০ সে.মি.
পত্রফলক	মাতৃ জাতের চেয়ে বেশি সবুজ, মোমের আস্তরণযুক্ত	ছোট, গাঢ় সবুজ, ডিম্বাকৃতির, বিনাচীনাবাদাম -৩ এর চেয়ে চ্যাপ্টা	গাঢ় সবুজ, বিনাচীনাবাদাম-২ এর চেয়ে কম চ্যাপ্টা, লম্বা ও বর্শাকৃতির

বৈশিষ্ট্য	বিনাচীনাবাদাম-১	বিনাচীনাবাদাম-২	বিনাচীনাবাদাম-৩
ফল ও বীজ	ঢাকা-১ অপেক্ষা ফল ২৬% ও বীজ ৩০% বড়, বীজ আবরণ সাদাটে	ঢাকা-১ অপেক্ষা ফল ২৪% ও বীজ ২৮% বড়, বীজ আবরণ তামাটে	ঢাকা-১ অপেক্ষা ফল ২৭% ও বীজ ৪০% বড়, বীজ আবরণ তামাটে
রোগবালাই	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল
বিছাপোকার আক্রমণ	মাতৃ জাতের মতই	মাতৃ জাত অপেক্ষা আক্রমণ কম	মাতৃ জাত অপেক্ষা আক্রমণ কম
জীবনকাল (শীত মৌসুম) (গ্রীষ্ম/শরৎ মৌসুম)	১৫০-১৬০ দিন ১২৫-১৩৫ দিন	১৫০-১৬০ দিন ১২৫-১৩৫ দিন	১৫০-১৬০ দিন ১২৫-১৩৫ দিন
সর্বোচ্চ ফলন (শীত মৌসুম)	৩.৭০ টন/হে ১.৫০ টন/একর	৩.১৯ টন/হে ২.২৯ টন/একর	৩.০০ টন/হে ১.২১ টন/একর
সর্বোচ্চ ফলন (খরিফ-১ মৌসুম)	২.৩৭ টন/হে ০.৯৬ টন/একর	১.৬৬ টন/হে ০.৬৭ টন/একর	১.৫৫ টন/হে ০.৬৩ টন/একর
বীজে তেলের পরিমাণ (%)	৪৭	৫০	৫২
বীজে আমিষের পরিমাণ (%)	২৮	২৮	২৯

বিনাচীনাবাদাম-৪

ঢাকা-১ জাতের বীজে ২০০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায়, যার নামকরণ করা হয় D1/20/3M-30। এই মিউট্যান্টটি বিভিন্ন ফলন পরীক্ষায় এর মাতৃজাত ঢাকা-১ থেকে অনেক বেশি ফলন দেয় এবং কলার রট, সার্কোস্পোরা লিফ স্পট ও রাস্ট রোগ সহনশীল হওয়ায় বিনাচীনাবাদাম-৪ নামে বিগত ২০০৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড সারাদেশের কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

বিনাচীনাবাদাম-৪

এই জাতের গাছ মাতৃজাত অপেক্ষা খাটো এবং কান্ড প্রায় খাড়া। পত্রফলক অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং ফ্যাকাসে সবুজ। রবি এবং খরিফ উভয় মৌসুমে এই জাত চাষ করা যায়।

বিনাচীনাবাদাম-৫

এ জাতটি উদ্ভাবনের জন্য স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত ঢাকা-১ (মাইজচর) জাতের বীজে ২৫০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায় যার নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৩। পরবর্তীতে মিউট্যান্ট-৩ এর গাছের মধ্যে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি গাছ পাওয়া যায়, যা থেকে প্রাপ্ত পপুলেশনের নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৬। এই মিউট্যান্টটিকে আবার ২৫০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে M6/25/54-20 নামক একটি মিউট্যান্ট পাওয়া যায়। ২০১১ সালে এই

মিউট্যান্টটি বাংলাদেশের লবণাক্ত এলাকার পটুয়াখালী ও নোয়াখালী অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য বিনাচীনাবাদাম-৫ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন দেয়।

জাতটি ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া সময়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। প্রতি পড়ে দানার সংখ্যা মূলত ২টি এবং পড়ে দানার শতকরা হার ৭৫-৭৭ ভাগ।

বিনাচীনাবাদাম-৫

বিনাচীনাবাদাম-৬

বিনাচীনাবাদাম -৬ জাতটি উদ্ভাবনের জন্য স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত ঢাকা-১ (মাইজচর) জাতের বীজে ২৫০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর স্থায়ী কৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে একটি মিউট্যান্ট বা প্রজনন সারি পাওয়া যায় যার নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৩। পরবর্তীতে মিউট্যান্ট-৩ এর গাছের মধ্যে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি গাছ পাওয়া যায়, যা থেকে প্রাপ্ত পপুলেশনের নামকরণ করা হয় মিউট্যান্ট-৬। এই মিউট্যান্টটিকে আবার ২৫০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে M6/25/64-82 নামক একটি মিউট্যান্ট পাওয়া যায়। ২০১১ সালে এই মিউট্যান্টটিকে জাতীয় বীজ বোর্ড বাংলাদেশের লবণাক্ত এলাকার খুলনা, নোয়াখালী, বাগেরহাট ও পটুয়াখালী অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য বিনাচীনাবাদাম-৬ নামে অনুমোদন দেয়।

বিনাচীনাবাদাম-৬

জাতটি ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া সময়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। প্রতি পড়ে দানার সংখ্যা মূলত ২টি এবং পড়ে দানার শতকরা হার ৭৫-৭৭ ভাগ।

সারণী: ২ বিনাচীনাবাদাম-৪, বিনাচীনাবাদাম-৫ ও বিনাচীনাবাদাম-৬ এই তিন জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	বিনাচীনাবাদাম-৪	বিনাচীনাবাদাম-৫	বিনাচীনাবাদাম-৬
গাছের উচ্চতা	গাছ মাতৃ জাত অপেক্ষা ছোট	গাছ মধ্যম আকৃতির ও খাড়া, গাছের উচ্চতা ২৫.৫৩ সে.মি.	গাছ খাটো ও খাড়া, গাছের উচ্চতা ১৬.৮১ সে.মি.
পত্রফলক	মাতৃ জাতের চেয়ে লম্বা ফ্যাকাসে সবুজ	পত্রফলক লম্বা ডিম্বাকৃতির ও সবুজ	পত্রফলক লম্বা ডিম্বাকৃতির ও হালকা সবুজ
ফল ও বীজ	মাতৃ জাত অপেক্ষা ফল ২৬% ও বীজ ৩০% বড়, বীজ আবরণ সাদাটে	মাতৃ জাত অপেক্ষা ফল ১০% ও বীজ ১৫% বড়	মাতৃ জাত অপেক্ষা ফল ৩০% ও বীজ ৪০% বড়
রোগবালাই	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল	কলার রট, সার্কোস্পোরা পাতার দাগ ও মরিচা রোগ সহনশীল
বিছাপোকার আক্রমণ	মাতৃ জাতের মতই	মাতৃ জাত অপেক্ষা আক্রমণ কম	মাতৃ জাত অপেক্ষা আক্রমণ কম
জীবনকাল (শীত মৌসুম) (গ্রীষ্ম/শরৎ মৌসুম)	১৪০-১৫০ দিন ১০০-১২০ দিন	১৪০-১৫০ দিন	১৪০-১৫০ দিন

বৈশিষ্ট্য	বিনাচীনাবাদাম-৪	বিনাচীনাবাদাম-৫	বিনাচীনাবাদাম-৬
সর্বোচ্চ ফলন (শীত মৌসুম)	২.৬ টন/হে ১.০৪ টন/একর	২.১৪ টন/হে ০.৮৫ টন/একর	২.৪০ টন/হে ০.৯৬ টন/একর
সর্বোচ্চ ফলন (খরিফ-১ মৌসুম)	২.৪৭ টন/হে ০.৫৮ টন/একর	-	-
বীজে তেলের পরিমাণ (%)	৪৮.৬	৪৯.০	৪৮.৫১
বীজে আমিষের পরিমাণ (%)	২৭	২৫.৭২	২৮.৬৮

বিনাচীনাবাদাম-৭, বিনাচীনাবাদাম-৮ ও বিনাচীনাবাদাম-৯

২০০৬ সালে ঢাকা-১ জাতের বীজে ২০০ গ্রে ও PK-1 জাতের বীজে ২৫০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ এবং নির্বাচনের মাধ্যমে যথাক্রমে D1/20/17-1 ও I RS/25/3-1 মিউট্যান্ট ২টি পাওয়া যায়। এছাড়াও ঐ বছরই ঝিঙ্গাবাদামের সাথে ঢাকা-১ জাতের সংকরায়ণ এবং নির্বাচনের মাধ্যমে GC-1-24-1-1-2 প্রজনন সারিটি পাওয়া যায়। লবণাক্ত ও অলবণাক্ত এলাকায় ফলন পরীক্ষায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে D1/20/17-1 ও RS/25/3-1 মিউট্যান্ট দুটি এবং GC-1-24-1-1-2 প্রজনন সারিটি স্ব-স্ব মাতৃ জাত থেকে বেশি ফলন দিতে সক্ষম হওয়ায় ২০১৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড D1/20/17-1 কে বিনাচীনাবাদাম-৭, GC-1-24-1-1-2 কে বিনাচীনাবাদাম-৮ এবং RS/25/3-1 কে বিনাচীনাবাদাম-৯ নামে লবণাক্ত এলাকাসহ সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়। জাত ৩টি ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া সময়ে ৮ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।

বিনাচীনাবাদাম-৭

বিনাচীনাবাদাম-৮

বিনাচীনাবাদাম-৯

সারণী: ৩ জাত তিনটির বৈশিষ্ট্যাবলী

বৈশিষ্ট্য	বিনাচীনাবাদাম-৭	বিনাচীনাবাদাম-৮	বিনাচীনাবাদাম-৯
লবণাক্ততা সহ্যক্ষমতা	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি	ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি
গাছের উচ্চতা	মধ্যম আকৃতির	খাটো	মধ্যম আকৃতির
বাদাম ও দানার আকার	বাদাম ছোট ও দানা মধ্যম আকারের (১০০ বাদামের ওজন ৬০-৭০ গ্রাম ও দানার ওজন ৩০-৩৩ গ্রাম)	বাদাম ও দানা মধ্যম আকারের (১০০ বাদামের ওজন ৭০-৭৫ গ্রাম ও দানার ওজন ২৯-৩০ গ্রাম)	বাদাম ও দানা মধ্যম আকারের (১০০ বাদামের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম ও দানার ওজন ৩৪-৩৫ গ্রাম)
দানার হার (%)	৬০-৭৯	৬০-৭৯	৮২-৮৪
বীজে আমিষ ও তেলের পরিমাণ	যথাক্রমে ২৮.০ ও ৪৮.৩%	যথাক্রমে ২৮.১ ও ৪৬.৯%	যথাক্রমে ২৩.৮ ও ৪৮.০%

বৈশিষ্ট্য	বিনাচীনাবাদাম-৭	বিনাচীনাবাদাম-৮	বিনাচীনাবাদাম-৯
জীবন কাল	১৩৫-১৪৫ দিন	১৩৫-১৪৫ দিন	১৩৫-১৪৫ দিন
গড় ফলন (টন/হে)	স্বাভাবিক মাটিতে ২.৫২ ও লবণাক্ত মাটিতে ১.৮	স্বাভাবিক মাটিতে ২.৫৬ ও লবণাক্ত মাটিতে ১.৮	স্বাভাবিক মাটিতে ২.৯ ও লবণাক্ত মাটিতে ১.৯

বিনাচীনাবাদাম-১০

চাষ উপযোগী এলাকা বান্দরবান, চকোরিয়াসহ সমগ্র বাংলাদেশের উৎপাদনাধীন এলাকা। প্রতি গাছে ২২-৩২টি বাদাম ধরে। বাদাম মধ্যম আকারের (১০০ বাদামের ওজন ৭০-৭৫ গ্রাম)। দানার রং ও আকার তামাটে লাল রঙের ও মাঝারি। সেলিং হার ৭২-৭৫%, বীজে আমিষ ২৮.১০% ও তেলের পরিমাণ ৫০.৬%। জীবনকাল ফেব্রুয়ারি মাসে রোপণ করলে ১২৫-১৩০ দিন এবং খরিফ-২ মৌসুমে ১১০-১২০ দিন। গড় ফলন ফেব্রুয়ারি রোপণ ২.৮ টন/হে. ও খরিফ-২ মৌসুমে ২.২ টন/হে.।

বিনাচীনাবাদাম-১০

চীনাবাদামের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

বাংলাদেশের সর্বত্র চীনাবাদামের চাষ করা যায়। বেলে, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ মাটিতে এর চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। লবণাক্ত এলাকা খুলনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, নোয়াখালী জেলা এবং বাংলাদেশের বাদাম উৎপাদন এলাকাসহ সারা বাংলাদেশে চীনাবাদাম চাষাধীন এলাকায় চাষ উপযোগী।

জমি তৈরি

জমির আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে ৩-৪টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে নিতে হবে। লবণাক্ত এলাকায় রোপণের সময় মাটির লবণাক্ততা ৫ ডিএস/মি এর কম হবে।

বপনের সময়

বছরের যে কোন সময় এর চাষ করা যায় তবে নিম্নলিখিত সময়ে চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে।

রবি মৌসুম: ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি।

খরিফ-২ মৌসুম: আগস্টের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত।

বীজের হার: জাত অনুযায়ী বীজের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

জাতের নাম	হেক্টর প্রতি (খোসাসহ) (কেজি)	একর প্রতি (খোসাসহ) (কেজি)
বিনাচীনাবাদাম-১	১৫০-১৬০	৬০-৬৫
বিনাচীনাবাদাম ২	১৫০-১৬০	৬০-৬৫
বিনাচীনাবাদাম-৩	১৫০-১৬০	৬০-৬৫
বিনাচীনাবাদাম -৪	১৩০-১৪০	৫২-৫৬
বিনাচীনাবাদাম -৫	১২০-১২৫	৪৮-৫০

জাতের নাম	হেক্টর প্রতি (খোসাসহ) (কেজি)	একর প্রতি (খোসাসহ) (কেজি)
বিনাচীনাবাদাম -৬	১২৫-১৩০	৫০-৫২
বিনাচীনাবাদাম -৭	১১০-১২০	৪৫-৫০
বিনাচীনাবাদাম -৮	১৪০-১৫০	৫৭-৬০
বিনাচীনাবাদাম -৯	১৪০-১৫০	৫৭-৬০
বিনাচীনাবাদাম -১০	১৪০-১৫০	৫৭-৬০

বীজ শোধন

বপনের আগে বীজ শোধন করা ভাল। প্রতি ৪০০ গ্রাম বীজে ১ গ্রাম প্রোভ্যাক্স বা অটাস্টিন বা নোরিন নামক বীজ শোধনকারী ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে। শোধিত বীজ জমিতে বপন করলে চারা গজানোর হার বেড়ে যাবে। গজানোর পর অনেক সময় পিপড়া ও পাখি বাদামের দানা ও চারাগাছ উঠিয়ে ফেলে, এক্ষেত্রে বীজ বপনের সময় সেভিন ডাস্ট ও ফুরাডান মিশিয়ে বীজ বপন করা ভালো।

বপন পদ্ধতি

বীজ সারিতে লাগাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সে.মি. (১২ ইঞ্চি) এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১৫ সে.মি. (৬ ইঞ্চি)। বীজগুলো মাটির ২.৫-৪.০ সে.মি. (১.০-১.৫ ইঞ্চি) নিচে পুঁতে দিতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	হেক্টর প্রতি (কেজি)	একর প্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	৪০-৫০	১৬-২০
টিএসপি	১৬৫-১৭৫	৬৭-৭১
এমওপি	১৩০-১৪০	৫৩-৫৭
জিপসাম	১১০-১২০	৪৫-৪৯
জীবাণুসার বীজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে (ইউরিয়ার পরিবর্তে)	২.২	১.০
দস্তা (জিংক)	২.৫-৫.০	১.০-২.০
বোরন	৩.০-৫.০	১.২-২.০
মলিবডেনাম	১.০-১.৫	০.৪-০.৬

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সমস্ত সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। সব জমিতে বোরন, দস্তা ও মলিবডেনাম প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। যে সব জমিতে উক্ত সারের অভাব আছে কেবলমাত্র সেইসব জমিতেই প্রয়োগ করতে হবে। বপনের সময় প্রতি কেজি বীজের জন্য ৪০ গ্রাম জীবাণু সার দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। জীবাণু সার দিলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন হয়না।

সেচ প্রয়োগ

বিনাচীনাবাদাম চাষে সেচের প্রয়োজন হয়না। জমিতে সঞ্চিত রসের উপর নির্ভর করেই এই ফসল আবাদ করা যায়। তবে শুষ্ক অঞ্চল, তীব্র রৌদ্র কিরণ এবং নিম্ন আর্দ্রতায় সেচ দেয়া হলে উচ্চ ফলন পাওয়া যেতে পারে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা

পিপীলিকা: বাদামের বীজ বপনের পর পিপীলিকা আক্রমণ করে বীজ খেয়ে ফেলতে পারে। তাই বপনের পর ক্ষেতের চারদিকে সেভিনডাস্ট ৮৫ এসপি ছিটিয়ে দিলে বীজ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। এছাড়া ক্ষেতের চারদিকে লাইন টেনে কেরোসিন তেল দিয়েও পিপীলিকা দমন করা যায়।

উঁইপোকা: চীনাবাদামের গাছ এবং বাদামের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এরা গাছের প্রধান শিকড় কেটে দেয় এবং শিকড়ের ভিতর গর্ত সৃষ্টি করে বিধায় গাছ মারা যায়। উঁইপোকা মাটির নিচের বাদামের খোসা ছিদ্র করে বীজ খেয়ে ফেলে।

প্রতিকার:

- কেরোসিন মিশিয়ে পানি সেচ দিলে উঁইপোকা জমি ত্যাগ করে।
- পাট কাঠির ফাঁদ তৈরি করে এ পোকা কিছুটা দমন করা যায়। মাটির পাত্রে পাট কাঠি ভর্তি করে পুঁতে রাখলে তাতে উঁইপোকা লাগে। তারপর ঐ কাঠি ভর্তি পাত্র তুলে উঁইপোকা মারতে হবে।
- আক্রান্ত মাঠে ডায়াজিনন-১০জি/বাসুডিন-১০জি বা ডাসবান-১০ যথাক্রমে প্রতি হেক্টরে ১৫, ১৪ ও ৭.৫ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

চীনাবাদামের পাতা ছিদ্রকারী পোকা: এই পোকার কীড়া পাতার ভিতরে অবস্থান করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। অধিক আক্রান্ত গাছ পুড়ে যাওয়ার মত মনে হয়।

পাতা মোড়ানো পোকা: এই পোকার কীড়া ছোট পাতাগুলোকে মুড়িয়ে ভিতরে বসে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে ফলে পাতা সাদা হয়ে যায়।

বিছা পোকা: এই পোকার কীড়া দলবদ্ধভাবে পাতার নীচে থেকে সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালের মত করে ফেলে।

জ্যাসিড বা পাতা হপার: অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পূর্ণাঙ্গ পোকা গাছের পাতার রস শোষণ করে। প্রথমে পাতার কিনারা হলুদ তামাটে পরে লালচে রং ধারণ করে। এ পোকা ভাইরাস রোগের বাহক হিসাবেও কাজ করে।

জাব পোকা: বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক জাব পোকা পাতার উল্টো দিক থেকে রস শোষণ করে থাকে। আক্রমণের ফলে পাতা কিছুটা কুকড়ে যায়।

পাতা ছিদ্রকারী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বিছা পোকা, জ্যাসিড বা পাতা হপার এবং জাব পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থা:

- বিনাচীনাবাদাম-৭ জাতটি জ্যাসিড ও পাতা মোড়ানো পোকা এবং বিনাচীনাবাদাম-৮ ও বিনাচীনাবাদাম-৯ জাত দু'টির জ্যাসিড, পাতা মোড়ানো ও বিছা পোকার আক্রমণ সহ্য ক্ষমতা বেশি।
- আলোর ফাঁদ পেতে ও আক্রান্ত ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে পতঙ্গভুক পাখি বসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- জাব ও জ্যাসিড বা পাতা হপারের ক্ষেত্রে পরজীবী ও পরভোজী উভয় ধরণের পোকার বংশ বৃদ্ধি করতে হবে।

- বিছা পোকার ক্ষেত্রে আক্রমণের প্রথম অবস্থায় পাতার নিচে দলবদ্ধ বিছাগুলোকে সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে অথবা কোন কিছু দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে।
- পাতা ছিদ্রকারী ও পাতা মোড়ানো পোকা দমনের জন্য ১০ লিটার পানির সাথে ২০ মি.লি. ক্লাসিক ২০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বিছা পোকার ক্ষেত্রে ১০ লিটার পানির সাথে ১১ মি.লি. রিপকার্ড ১০ ইসি মিশিয়ে অথবা সাইথ্রিন ১০ ইসি একই মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- চীনাবাদামের জ্যাসিড বা পাতা হপারের ক্ষেত্রে ১০ লিটার পানিতে ১১ মি.লি. সিমবুশ ১০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

- জাব পোকার আক্রমণ হলে ১০ লিটার পানিতে ১১ মি.লি. সাইথ্রিন ১০ ইসি বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২০ মি.লি. মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চীনাবাদামের পাতার দাগ রোগ

আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে আগাম দাগ রোগ বপনের ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে দেখা দিতে পারে। ফলে পাতার উপরিভাগে গাঢ় বাদামী রং এর উপ-বৃত্তাকার দাগ এবং পাতার নিচের দিকে হাল্কা বাদামী রং এর ছাপ পড়ে। রোগের আক্রমণ যখন খুব বেশি হয় তখন ছোট ছোট উপ-বৃত্তাকার দাগগুলো মিলে বড় দাগের সৃষ্টি হয়ে পাতার সবুজ রং নষ্ট করে ফেলে। ফলে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং পাতা গাছ থেকে অকালে ঝরে পড়ে। আগাম পাতার দাগ রোগ ও বিলম্বে আসা দাগ রোগের মধ্যে পার্থক্য হলো আগাম দাগ রোগের ক্ষেত্রে দাগগুলো অপেক্ষাকৃত হাল্কা রঙের হয় এবং দাগের চতুর্দিকের সবুজ রং নষ্ট হয়ে গর্তের মত ক্ষতের সৃষ্টি করে।

চীনাবাদামের মরিচা রোগ

বিলম্বে আসা দাগ রোগ ও মরিচা পড়া রোগ সাধারণত একই সাথে চীনাবাদামকে আক্রমণ করে। প্রাথমিক অবস্থায় পাতার নিচের পিঠে কমলা রঙের সামান্য উঁচু বিন্দুর মত দাগ দেখা যায় এবং এটা ফেটে গিয়ে লাল-বাদামী রঙের স্পোর বের হয়ে আসে। আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাতার উপরের পিঠেও এ দাগ দেখা যায়। ফুল ছাড়া মাটির উপরের যে কোন অঙ্গে দাগ দেখা যেতে পারে। তবে কান্ডের গায়ে সৃষ্ট দাগ লম্বাকৃতির হয়। মরিচা রোগে আক্রান্ত পাতাগুলোতে ধীরে ধীরে শক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে শুকিয়ে যায় এবং গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় লেগে থাকে।

চীনাবাদামের পাতার দাগ ও মরিচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

- পাতার দাগ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে গাছে ব্যাভিষ্টিন অটাস্টিন/ নোরিন ৫০ ডবিউপি ২ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রতি ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার ছিটালে রোগের প্রকোপ কমে যায়। এ ক্ষেত্রে ইন্ডোফিল এম-৪/ স্কোর ডায়থেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানির সাথে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ২ বার ব্যবহার করা যায় অথবা ফলিকুর প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মি.লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

- বিনাচীনাবাদাম-৮ জাতটির মরিচা পড়া রোগ সহ্যক্ষমতা বেশি। তারপরও এ রোগ দেখা দিলে ফলিকুর নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মি.লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। অথবা

স্কোর/ ইন্ডোফিল এম-৪৪ ক্যালিক্সিন বা টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানির সাথে আধা মি.লি. হারে মিশিয়ে ১২ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গোড়া পঁচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে কান্ড পঁচে যায় এবং ধীরে ধীরে গাছ মরে যায়।

প্রতিকার

- রোগাক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলতে হয়।
- প্লাবন সেচ দিয়ে আক্রমণ রোধ করা যায়।
- শস্য পর্যায় অনুসরণ করে এ রোগের আক্রমণ কমানো যায়।
- বপনের পূর্বে ৪ মিলিগ্রাম এগ্রোসান প্রোভেক্স/ নোরিন/ অটাস্টিন দিয়ে প্রতি কেজি বীজ শোধন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

ভাল বীজ বা গুণগতমানের বীজ পেতে হলে ফসল যথাসময়ে তুলতে হবে। ফসল সঠিক সময় তুলতে হলে ফসলের পরিপক্কতা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা থাকা আবশ্যক। চীনাবাদাম বীজ খুবই সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর। কাজেই চীনাবাদাম গাছের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ বাদাম যখন পরিপূর্ণভাবে পরিপক্ক হয় তখন বাদামের খোসার শিরা উপ-শিরাগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গাছের পাতাগুলি হলুদ রং ধারণ করে নিচের পাতা ঝরে পড়তে থাকে। বাদামের খোসা ভাঙ্গার পর খোসার ভিতরে সাদা কালচে দাগ দেখা যাবে এবং বীজের উপরের পাতলা আবরণ বা খোসা বাদামি বা লালচে বা বেগুনি রং (জাত ভেদে) ধারণ করলেই বুঝতে হবে ফসল উঠানোর উপযুক্ত সময় হয়েছে। পরিপক্ক হবার আগে বাদাম উঠালে তা হতে ফলন এবং তেল কম হবে। আবার দেরিতে উঠালে সুপ্ততা না থাকার দরুন জমিতেই অংকুরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। শস্য তোলার পর গাছ থেকে খোসাসহ ছাড়ানো বাদাম উজ্জ্বল রোদে দৈনিক ৭-৮ ঘন্টা করে ৫-৬ দিন শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। সাধারণত এ অবস্থায় বীজের আর্দ্রতা ৮-১০% হয়ে থাকে। রোদে শুকানোর পর খোসাসহ বাদাম ঠান্ডা করে উপযুক্ত পাত্রে গুদামজাত করতে হবে। বাদাম বীজ সংরক্ষণের জন্য পলিথিন আচ্ছাদিত বা সিনথেটিক ব্যাগ, চটের বস্তা, মাটির কলসি বা মটকা, কেরোসিন টিন বা ড্রাম, বাঁশের তৈরি ডুলি বা ঝুড়ি, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি সচরাচর এ দেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাটির পাত্র ও বাঁশের ডুলিতে বীজ সংরক্ষণের পূর্বে কাদামাটি ও গোবর দিয়ে আস্তরণ দিয়ে নিতে হবে, যাতে বাতাসের আর্দ্রতা পাত্রের ভিতরে ঢুকতে না পারে। আর চটের বস্তার বীজ সংরক্ষণ করার পূর্বে প্রথমে চটের বস্তার সমপরিমাণ মাপের বা সাইজের পলিথিন ব্যাগ চটের বস্তার ভিতর ঢুকিয়ে তারপর পলিথিন ব্যাগে বীজ রেখে পলিথিন ব্যাগ ও চটের বস্তার মুখ ভালভাবে বেঁধে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে বাইরের বাতাস ব্যাগের ভিতর ঢুকতে না পারে। এর পর বাদাম বীজসহ চটের বস্তা কাঠের বা বাঁশের তৈরি মাচায় রেখে দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে (আষাঢ়-ভাদ্র) প্রতি মাসে একবার পরিষ্কার রোদে শুকনো খোলায় গুদামজাত বীজ দৈনিক ৩-৪ ঘন্টা শুকিয়ে ঠান্ডা করে পুনরায় পলিথিন ব্যাগ বা টিনের ড্রামে বীজ সংরক্ষণ করলে বীজের মান বা গুণাগুণ নষ্ট হয় না। নিম্নলিখিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়েও বীজ সংরক্ষণ করা যায়। ঠান্ডা ঘর (কোল্ড রুম) যেখানে তাপমাত্রা ১৮-২০° সে. থাকে এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৪০-৪৫% থাকে সেখানে ১ বৎসর থেকে ২ বৎসর পর্যন্ত শুকানো বীজ (৮ থেকে ১০% বীজের আর্দ্রতা) সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়। ডিপ ফ্রিজ বা অধিক ঠান্ডা ঘর যেখানে তাপমাত্রা ৩-৪° সে. এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৩০% এর নিচে থাকে সেখানে শুকানো বীজ (৭-৮% বীজের আর্দ্রতা) ৩-৫ বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

তিল ফসল

তিল (*Sesamum indicum* L.) পেডালিয়েসি (Pedaliaceae) গোত্রের অন্তর্গত এবং তেল উৎপাদনকারী এক প্রকার উদ্ভিদ। তিলের বীজে তেলের পরিমাণ ৩৭%-৬৩% পর্যন্ত হতে পারে। এ তেলে মানব শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ৮০% এর বেশি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড আছে। বাংলাদেশে তেলজাতীয় ফসল উৎপাদনের মধ্যে সরিষা, চীনাবাদাম ও সয়াবিনের পরে তিলের অবস্থান। এ ফসলটি রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে আবাদ করা যায়। বর্তমানে তিল আবাদকারী জমির পরিমাণ প্রায় ৮৯,৫০০ হেক্টর এবং বছরে উৎপাদন প্রায় ৮৯,৫০০ মে.টন (সূত্র: AIS, 2018)। তিল ফসল কুয়াশা, জলাবদ্ধতা ও চারা অবস্থায় পানি সহ্য করতে পারে না। এ ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য ৫০০-৬০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। অনবরত বৃষ্টির প্রভাবে এ ফসল অধিক পরিমাণে রোগ-বালাই আক্রান্ত হয়। তবে সর্বোচ্চ ১০০০ মিলিমিটার এবং সর্বনিম্ন ৩০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সহ্য করতে পারে। তিল থেকে তেল উৎপাদন ছাড়াও কনফেকশনারীতে ও গৃহে বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট, খাজা, মোয়া, পিঠা, পাউরুটি, রোল, বান, কেক, কুকি, ক্যান্ডি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যায় যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখতে সক্ষম।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) থেকে এ পর্যন্ত তিলের চারটি জাত বিনাতিল-১, বিনাতিল-২, বিনাতিল-৩ ও বিনাতিল-৪ উদ্ভাবিত হয়েছে যা খরিফ মৌসুমে চাষ উপযোগী। জাতভেদে হেক্টর প্রতি ফলন ১৫০০-১৮০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

তিলের জাত

বিনাতিল-১

বিদেশ থেকে সংগৃহীত একটি জার্মপ্লাজম এম-৩০ বীজে ৫০০ গ্রে মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এসএম-৭ মিউট্যান্ট লাইনটি বাছাই করা হয়। মিউট্যান্টটির গুণগত বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট উন্নত পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী নির্বাচনী ধাপে তিলের স্থানীয় জাত টি-৬ ও এসএম-৭ মিউট্যান্ট লাইনটি দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে তুলনামূলক ফলন ও অন্যান্য গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষণ ফলাফল বিশেষণ করে দেখা যায় যে, এসএম-৭ মিউট্যান্ট লাইনটি অধিক ফলনশীল এবং টি-৬ অপেক্ষা বেশি ফলন দেয়। ২০০২ সালের জুলাই মাসে এসএম-৭ মিউট্যান্ট লাইনটি দেশব্যাপী চাষের জন্য বিনাতিল-১ নামে একটি উন্নত জাত হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হয়।

মাঠে বিনাতিল-১

বিনাতিল-১ এর বীজ

গাছ শাখাবিহীন, পাতা সরু, লম্বা ও গাঢ় সবুজ; প্রতিটি গিরায় ৩-৬ টি বড় আকারের লম্বা ফল ধরে; জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন; জাতটির বীজাবরণ পাতলা, নরম ও ক্রিম রঙের; হেক্টর প্রতি ফলন ১.৩-১.৭ টন; বীজে ৫০-৫২% তেল থাকে যা অন্যান্য জাতের তুলনায় ৫-৭% বেশি; লবণাক্ত এলাকায় (৬-৭ ডিএস/মিটার) চাষাবাদের উপযোগী।

বিনাতিল-২

স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত টি-৬ জাতের বীজে ৭০০ গ্রে গামা-রশ্মি প্রয়োগ করার পর বাছাই পদ্ধতি অনুসরণ করে উন্নত মিউট্যান্ট লাইন (এসএম-১২) নির্বাচন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পর নতুন জাত হিসেবে ২০১১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক দেশ ব্যাপী চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

মাঠে বিনাতিল-২

বিনাতিল-২ এর বীজ

জাতটি শাখাযুক্ত, প্রতি গাছে শাখার সংখ্যা ২-৪ টি; জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন; বীজাবরণ হালকা কালো রঙের; হেক্টর প্রতি ফলন ১.৪-১.৮ টন; বীজে তেলের পরিমাণ ৪০% এবং তেলে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড ও ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে বিদ্যমান।

বিনাতিল-৩

বিনাতিল-১ জাতের বীজে ৫০০ গ্রে মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে মিউট্যান্ট লাইন এসএম-১০-০৪ নির্বাচন করা হয় যা বিনাতিল-১ ও বারিতিল-২ এর তুলনায় উন্নত। পরবর্তীতে ২০১০ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত মিউট্যান্টটিকে বিনাতিল-১ ও বারিতিল-২ এর সহিত বিনা'র বিভিন্ন উপকেন্দ্র মাঠ এবং তিল চাষাধীন এলাকায় কৃষকের মাঠে রংপুর, কুমিল্লা, পাবনা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মাগুরা, ফরিদপুর, যশোর, ঝিনাইদহ ফলন পরীক্ষা করা হয়। ফলনসহ অন্যান্য কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় এসএম-১০-০৪ মিউট্যান্টটিকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন এবং নতুন জাত বিনাতিল-৩ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ সালে দেশব্যাপী চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়।

মাঠে বিনাতিল-৩

বিনাতিল-৩ এর বীজ

জাতটি শাখাবিশিষ্ট, প্রতি গাছে শাখার সংখ্যা ২-৪ টি, প্রতিটি পত্রকক্ষে ২-৩ টি ফল ধরে; জীবনকাল ৮৫-৮৭ দিন; বীজাবরণ কালো রঙের; হেক্টর প্রতি ফলন ১.৫-১.৮ টন; বীজে তেলের পরিমান ৪৩%।

বিনাতিল-৪

স্থানীয়ভাবে চাষাবাদকৃত টি-৬ জাতের বীজে ৭০০ গ্রে মাত্রায় গামারশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে মিউট্যান্ট লাইন এসএম-৯ নির্ধারণ করা হয় যা অন্য সব মিউট্যান্ট এবং টি-৬ এর তুলনায় উন্নত। মিউট্যান্ট লাইনটিকে বিনা'র বিভিন্ন উপকেন্দ্রের খামার এবং তিলচাষ উপযোগী কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা করা হয়। উন্নত বৈশিষ্ট্যের কারণে এসএম-৯ মিউট্যান্ট লাইনটিকে নতুন জাত, 'বিনাতিল-৪' হিসেবে ২০১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সারা দেশে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হয়।

মাঠে বিনাতিল-৪

বিনাতিল-৪ এর বীজ

এ জাতের গাছ শাখা বিশিষ্ট এবং প্রতি গাছে শাখার সংখ্যা ৩-৫টি; প্রতি পত্র কক্ষে ২-৩টি ফল ধরে। বীজাবরণ ধূসর কালো রঙের; জীবনকাল ৮৭-৯২ দিন; ফলন হেক্টর প্রতি ১.৫ টন-১.৭ টন।

তিলের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

বেলে দো-আঁশ হতে এটেল দো-আঁশ মাটি তিল চাষের জন্য উপযোগী। তবে বেলে দো-আঁশ মাটিতে তিল ভাল জন্মে। জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা থাকলে সব ধরনের মাটিতেই তিলের চাষ করা যায়। বাড়ন্ত অবস্থায় অনবরত বৃষ্টিপাত হলে তিল গাছ মরে যায়।

জমি তৈরি

মাটির প্রকারভেদে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে নিয়ে জমি সমান করে বীজ বপন করতে হবে। মুগসহ অন্যান্য ফসলের সাথে সাথী ফসল হিসেবে আবাদ করলে প্রধান ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করতে হবে।

বপনের সময়

খরিফ ও রবি উভয় মৌসুমেই তিল চাষ করা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে (মধ্য ফেব্রুয়ারি- মধ্য মার্চ) এবং রবি মৌসুমে (মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর) বীজ বপন করা উত্তম।

বীজ হার

- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৭-৮ কেজি। (প্রতি একরে ৩.০-৩.২ কেজি)
- সারিতে বপনের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৬-৭ কেজি। (প্রতি একরে ২.৪-২.৮ কেজি)

বপন পদ্ধতি
জমিতে রস বেশি হলে অল্প গভীরে বীজ বপন করতে হবে। অন্যদিকে বীজ বপনের সময় মাটি বেশি শুষ্ক হলে বপনের পূর্বে একটি হালকা সেচ দিয়ে জোঁ আসলে জমি প্রস্তুত করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যেতে পারে। বীজ ও শুকনো বালু একত্রে মিশিয়ে ছিটিয়ে বপন করলে সমান দুরত্বে বীজ ফেলতে সুবিধা হয়। তিল এর জন্য সারি থেকে সারির দুরত্ব ২৫-৩০ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ১০-১২ ইঞ্চি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ৫-৮ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ১.৫ হতে ২.০ ইঞ্চি দিতে হবে।

বীজ শোধন
কান্ড পঁচা তিলের প্রধান রোগ যা বীজবাহিত। তাই বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ২.০-৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে লাগালে এ রোগের আক্রমণ কমানো যায়।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	*সারের পরিমাণ (কেজি)*	
	হেক্টর প্রতি	*একর প্রতি*
ইউরিয়া	*১২০-১৬০*	*৪০-৫০*
টিএসপি	*১৪০-১৫০*	*৫২-৬০*
এমওপি	*৬০-৭০*	*১৬-২০*
জিপসাম	*১০০-১২৫*	*৪০-৪৫*
জিংক সালফেট (প্রয়োজনে)	*৪-৬*	*৪*
বোরিক এসিড (প্রয়োজনে)	*৮-১০*	*৩*

সার প্রয়োগ পদ্ধতি
জমি প্রস্তুতকালে অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সার বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর গাছে ফুল আসা পর্যায়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা

আগাছা দমন
চারা অবস্থায় প্রায় ২০ দিন পর্যন্ত তিল গাছের বৃদ্ধি ধীর গতিতে হতে থাকে বিধায় এ সময় একটি নিড়ানী দিতে হবে যেন জমির আগাছা দ্রুত বেড়ে তিল গাছ ঢেকে ফেলতে না পারে।

সেচ
সাধারণত তিল চাষাবাদে সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে বপনের সময় মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে একটি হালকা সেচ দিয়ে জোঁ আসার পর চাষ দিয়ে বীজ বপন করে বীজ গজানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর ফুল আসার সময় জমিতে রসের অভাব হলে একবার এবং পরবর্তীতে খরা হলে ৫৫-৬০ দিন পর ফল ধরার সময় আরও একবার হালকা সেচ দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, তিল ফসল দীর্ঘ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই জমির মধ্যে মাঝে মাঝে নালা কেটে বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে ফসলকে রক্ষা করতে হবে। জলাবদ্ধতা বা অতিরিক্ত আর্দ্রতা তিল চাষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে দ্রুত গোড়াপচাঁ রোগ হয়ে তিলগাছ মরে যায়। এজন্য জমি প্রস্তুতের সময় পানি নিষ্কাশনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

রোগ-বালাই দমন

কান্ড পঁচা রোগ

কলেটোট্রিকাম ডেমাশিয়াম নামক ছত্রাক থেকে এ রোগ সৃষ্টি হয়। জমিতে কান্ড পঁচা রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে বাজারে যে সকল ছত্রাকনাশক পাওয়া যায়, যেমন ডাইথেন এম-৪৫ দুই গ্রাম হারে বা ব্যভিষ্টিন এক গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৮-১০ দিন পর পর তিনবার দুপুর ২-৩ ঘটিকার সময় ফসলে স্প্রে করে রোগটি দমন করা যেতে পারে।

বিছাপোকা

বিছাপোকা ডিম পাড়ার পর অথবা ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার সাথে সাথে ডিমসহ পাতা ছিড়ে মেরে ফেলতে হবে। পোকার আক্রমণ বেশি হলে নাইট্রো ৫০৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে আক্রান্ত জমিতে স্প্রে করতে হবে। তাছাড়া তিলে হক মথ দমনের ক্ষেত্রেও বিছাপোকা দমনের ন্যায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া পাতা মোড়ানো ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হলে পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি বা সবিক্রন ৪২৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর দুই বার স্প্রে করতে হবে।

ফসল কর্তন, মাড়াই ও বীজ সংরক্ষণ

তিল ফসল সংগ্রহ করতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে। পাতা, কান্ড ও ফল হলুদাভ বা খড়ের বর্ণ ধারণ করলে গাছ জমি থেকে কেটে ফেলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বেশি পরিপক্কের কারণে গাছের নিচের দিকের ফল হতে বীজ ঝরে না যায়। ফসল কাটার পর বাড়ীর উঠানে পলিথিন বিছিয়ে তিন থেকে চার দিন স্তুপ করে রাখার পর তিল গাছ রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে মাড়াই করতে হবে। মাড়াই করা বীজ রোদে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে এরপরে ঠান্ডা করে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে-

- মাড়াই করার পর বীজ বিশেষ যত্নসহকারে শুকাতে হবে। যদি রোদের উত্তাপ খুব প্রখর হয়, তাহলে বীজ একটানা তিন থেকে চার ঘন্টার বেশি রোদে শুকানো ঠিক নয়। কারণ কড়া রোদে অনেকক্ষণ ধরে বীজ শুকালে অংকুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রতিদিন অল্প সময় করে অর্থাৎ দুই থেকে তিন ঘন্টা করে কয়েক দিন শুকাতে হবে। বীজ সরাসরি সিমেন্টের তৈরি খোলায় না শুকিয়ে ত্রিপল বা চাটাইয়ের উপর শুকাতে হবে। বীজ এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে বীজের আর্দ্রতা ৯% এর বেশি না থাকে।
- শুকানোর পর বীজ ভালোভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- বীজ সংরক্ষণের পূর্বে এর অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- বীজ রাখার জন্য পলিথিনের ব্যাগ, টিনের ড্রাম, আলকাতরা মাখা মাটির মটকা বা কলসী, বিস্কুটের টিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মোটা পলিথিনের ব্যাগে বীজ রেখে মুখ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে তা আবার একটি চটের বস্তায় ভরে রাখলে ভালো হয়। পলিথিনের ব্যাগ বা ধাতব পাত্র যাই হোক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এর মুখ ভালোভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে যেন কোনভাবেই ভিতরে বাতাস ঢুকতে না পারে। বীজ শুকানোর পর গরম অবস্থায় সংরক্ষণ না করে ঠান্ডা হলে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বীজের পাত্র অবশ্যই ঠান্ডা অথচ শুষ্ক জায়গায় রাখতে হবে এবং সরাসরি মেঝেতে না রেখে মাচা বা কাঠের তক্তার উপর রাখলে ভালো হয়।
- মাঝে মধ্যে বীজের আর্দ্রতার দিকে নজর রাখতে হবে। বীজের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে প্রয়োজনমতো রোদে শুকিয়ে নিতে হবে এবং পূর্বের ন্যায় একই নিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে।

সয়াবিন

বর্তমানে বিশ্বে আমিষ এবং ভোজ্যতেল উৎপাদকারী শস্যগুলোর মধ্যে সয়াবিনের অবস্থান প্রথম। অধিকাংশের মতে সয়াবিনের আদি উৎপত্তিস্থল চীন তবে উৎপাদনের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা রয়েছে সর্বাগ্রে। সয়াবিনে আমিষ (৪০-৪৫%), কোলেস্টেরলমুক্ত তেল (১৮-২০%) এবং ২১% শর্করাসহ দেহের পুষ্টিসাধন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানাবিধ পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। অপর দিকে তেল সমৃদ্ধ বিধায় এটি ভোজ্যতেলের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়ক হতে পারে। সয়াবিন তেল থেকে প্রাপ্ত ফ্যাটি এসিডগুলো আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। সয়া প্রোটিনে সবগুলো অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড থাকায় এর জৈবমান মাছ-মাংসের মতো। দেশের ৯০ শতাংশ জনসাধারণের পক্ষে ব্যয়বহুল প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ক্রয় করার সামর্থ্য নেই। এক্ষেত্রে সয়াবিন থেকে প্রাপ্ত স্বল্প মূল্যের উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আমাদের প্রোটিন ঘাটতি জনিত জাতীয় পুষ্টি সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করতে পারে।

আমাদের দেশের আবহাওয়া সয়াবিন উৎপাদনের জন্য অনুকূল। দিন দিন সয়াবিন তেল ব্যবহার এ দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আমদানি করতে হয়। তাই দেশে যাতে এর উৎপাদন বাড়ানো যায়, সেজন্য বাংলাদেশ সরকার সয়াবিনের জাত উদ্ভাবন, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমে গুরুত্বারোপ করেছে। শুঁটি গোত্রীয় হওয়ায় সয়াবিন এ দেশের কম উর্বর জমি যথা- চরাঞ্চল এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় চাষ করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সর্বোপরি সয়াবিনের নানাবিধ ব্যবহার থাকায় ফসলটির চাষাবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারাদেশে চাষ উপযোগী হলেও নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর জেলায় সয়াবিনের চাষ বেশি হয়। তাছাড়া ভোলা, বরিশাল, ময়মনসিংহ যশোর, পাবনা, জামালপুর জেলাতেও সয়াবিন আবাদ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে সয়াবিনের পুষ্টিগুনের কথা বিবেচনা করে এ পর্যন্ত ৬টি জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়। নিম্নে সব কয়টি জাত এর বিবরণ দেয়া হলো।

বিনাসয়াবিন-১

সমন্বিত সয়াবিন চাষ প্রকল্প (বিনা অংগ) এর আওতায় দেশীয় এবং বৈদেশিক উৎস হতে সয়াবিনের বেশ কিছু জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়। ফলনের দিক থেকে উৎকৃষ্ট কিছু জার্মপ্লাজম বাছাই করে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন ও ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে BAU-S/80 লাইনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফলন পরীক্ষায় অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেওয়ায় ২০১১ সালে BAU-S/80 লাইনকে বিনাসয়াবিন-১ নামে বাণিজ্যিকভাবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়।

মাঠে বিনাসয়াবিন-১

বিনাসয়াবিন-১ এর বীজ

বিনাসয়াবিন-১ একটি হলুদ মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী জাত। গাছের উচ্চতা খাটো, পত্র গাঢ় সবুজ এবং বীজের রং হালকা হলুদ। এই জাতটি রবি এবং খরিফ উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়। রবি মৌসুমে জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। এই জাতটি বেলে থেকে দো-আঁশ জাতীয় মাটিতে চাষ উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ২.৪-৩.০ টন।

বীজে আমিষের পরিমাণ ৪৪.৫%, শর্করা ২৭% এবং তেল ১৯%। এই জাত সারা বাংলাদেশে চাষ করা সম্ভব, তবে উঁচু চর এলাকা বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বেশি উপযোগী।

বিনাসয়াবিন-২

জার্মপ্লাজম সংগ্রহ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ২০০৬ সালে সমন্বিত সয়াবিন চাষ প্রকল্প (বিনা অংগ)'র আওতায় দেশীয় এবং বৈদেশিক উৎস হতে বেশ কিছু সংখ্যক জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে ফলনের দিক হতে উৎকৃষ্ট কিছু জার্মপ্লাজম বাছাই করা হয়। তারপর দীর্ঘ চার বছর ধরে মাঠ পর্যায়ে বিনা'র গবেষণা খামার এবং সয়াবীন চাষাধীন এলাকায় কৃষকের জমিতে ফলন পরীক্ষা ও মূল্যায়ণের মাধ্যমে BAU-S/109 জার্মপ্লাজম লাইনটিকে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

মাঠে বিনাসয়াবিন-২

বিনাসয়াবিন-২ এর বীজ

এ জার্মপ্লাজম লাইনটি বিভিন্ন ফলন পরীক্ষায় অন্যান্য জাত যথা- সোহাগ, বারিসয়াবিন-৫ এবং বারিসয়াবিন-৬ থেকে বেশি ফলন দেয়। রবি মৌসুমে এর জীবনকাল ৯৫-১০৫ দিন। পরবর্তীতে ২০১১ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বীজ বোর্ড BAU-S/109 জার্মপ্লাজম লাইনটিকে 'বিনাসয়াবিন-২' নামে দেশের সয়াবিন চাষাধীন এলাকায় কৃষক পর্যায়ে রবি মৌসুমে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করে। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ২.৪-৩.৩ টন।

বিনাসয়াবিন-৩

সমন্বিত সয়াবিন চাষ প্রকল্প (বিনা অংগ) এর আওতায় দেশীয় এবং বৈদেশিক উৎস হতে বেশ কিছু সংখ্যক জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয় এবং ফলনের দিক হতে উৎকৃষ্ট হওয়ায় BAU-S/70 জার্মপ্লাজম লাইনটিকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন ফলন পরীক্ষায় লাইনটি সোহাগ, বারিসয়াবিন-৫ ও বারিসয়াবিন-৬ এর চেয়ে বেশি ফলন দেয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৩ সালে BAU-S/70 লাইনটিকে বিনাসয়াবিন-৩ নামে দেশের সয়াবিন চাষাধীন এলাকায় কৃষক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করে।

বিনাসয়াবিন-৩ একটি হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী জাত। গাছ লম্বা, পাতা সবুজ, হাইলাম ছোট এবং কালো, বীজের রঙ ক্রীম বর্ণের। এই জাতটি রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। রবি মৌসুমে এর জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন, বেলে থেকে দো-আঁশ মাটিতে এই জাত চাষ করা সম্ভব। হেক্টর প্রতি ফলন ২.৫-৩.২ টন।

মাঠে বিনাসয়াবিন-৩

বিনাসয়াবিন-৩ এর বীজ

বীজে আমিষের পরিমাণ ৪২.৫%, শর্করা ২৬% এবং তেল ২০%। সারা বাংলাদেশে এই জাত চাষাবাদ করা সম্ভব, কিন্তু উঁচু, চর এলাকা বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বেশি উপযোগী। রবি মৌসুমে মাঝারি থেকে নিচু জমিতে চাষ করা যায়। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ভোলা, যশোর এবং ময়মনসিংহ চাষের জন্য উপযোগী।

বিনাসয়াবিন-৪

জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৩ সালে BAU-S/78 লাইনটিকে বিনাসয়াবিন-৪ নামে দেশের সয়াবিন চাষাধীন এলাকায় কৃষক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করে। বিনাসয়াবিন-৪ হলুদ মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী। গাছ লম্বা, পাতা সবুজ, হাইলাম ছোট এবং কালো, বীজের রং ক্রীম বর্ণের। এই জাতটি রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়।

মাঠে বিনাসয়াবিন-৪

বিনাসয়াবিন-৪ এর বীজ

বিনাসয়াবিন-৪ এর জীবনকাল রবি মৌসুমে ১১৫-১২০ দিন, বেলে থেকে দো-আঁশ মাটিতে এই জাত চাষ করা সম্ভব। রবি মৌসুমে মাঝারি থেকে নিচু জমিতে চাষ করা যায়। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ভোলা, যশোর এবং ময়মনসিংহ চাষের জন্য উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ২.৪-৩.০ টন।

বিনাসয়াবিন-৫

বারিসয়াবিন-৫ জাতে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে মিউট্যান্ট লাইন SBM-18 উদ্ভাবন করা হয়। ২০১৭ সালে মিউট্যান্ট লাইন SBM-18 বিনাসয়াবিন-৫ নামে নিবন্ধিত হয়। বিনাসয়াবিন-৫ একটি হলুদ মোজাইক

ভাইরাস সহনশীল জাত। গাছের উচ্চতা মাঝারি লম্বা, পাতা অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি সবুজ। বীজের রং হলদে যা অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি উজ্জ্বল। এই জাতটি রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়।

মাঠে বিনাসয়াবিন-৫

বিনাসয়াবিন-৫ এর বীজ

বিনাসয়াবিন-৫ এর জীবনকাল রবি মৌসুমে ১০০-১০৫ দিন, বেলে থেকে দো-আঁশ মাটিতে এই জাত চাষ করা সম্ভব। রবি মৌসুমে মাঝারি থেকে নিচু জমিতে চাষ করা যায়। জাতটি দেশের সয়াবিন চাষাধীন সব এলাকা যথা নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ভোলা, যশোর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে চাষ করার জন্য উপযোগী। ফলন হেক্টর প্রতি ২.৪-৩.৩ টন।

বিনাসয়াবিন-৬

বারিসয়াবিন-৫ জাতের বীজে বিভিন্ন মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী প্রজন্মে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ৩০০ গ্রে মাত্রা হতে উন্নত মিউট্যান্ট লাইন এসবিএম-২২ নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক লাইনটিকে দেশের সয়াবিন চাষাধীন এলাকায় চাষাবাদের জন্য বিনাসয়াবিন-৬ নামে নিবন্ধন করা হয়।

বিনাসয়াবিন-৬ এর গাছ মাঝারি উচ্চতার, পাতা অন্যান্য জাতের তুলনায় গাঢ় সবুজ এবং বীজের রং হালকা হলুদ ও অন্যান্য জাতের বীজের তুলনায় বেশি উজ্জ্বল। জাতটি ভাইরাসজনিত হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল এবং পোকার আক্রমণও কম।

মাঠে বিনাসয়াবিন-৬

বিনাসয়াবিন-৬ এর বীজ

বিনাসয়াবিন-২ ও বিনাসয়াবিন-৩, ১২ ডিএস/মি. পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল এবং বাকি ৪ টি জাত ৮ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল। এ দেশের মাটি এবং আবহাওয়ায় রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই সয়াবিন চাষ করা যায়। বেলে দো-আঁশ হতে দো-আঁশ মাটি সয়াবিন চাষের জন্য বেশি উপযোগী। খরিফ বা

বর্ষা মৌসুমে চাষের জন্য নির্বাচিত জমি অবশ্যই উঁচু ও পানি নিষ্কাশনযোগ্য হতে হবে। রবি মৌসুমে মাঝারি উঁচু থেকে নিচু জমিতে চাষ করা যায়। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ভোলা, যশোর, রংপুর এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল জাতটি চাষের জন্য উপযোগী।

সারণী: বিনা উদ্ভাবিত সয়াবিনের ছয়টি জাতের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	বিনাসয়াবিন-১	বিনাসয়াবিন-২	বিনাসয়াবিন-৩	বিনাসয়াবিন-৪	বিনাসয়াবিন-৫	বিনাসয়াবিন-৬
গাছের উচ্চতা	৪৮-৫৭ সে.মি	২৭-৪২ সে.মি	৬২-৭০ সে.মি	৩৫-৪২ সে.মি	৫৫-৬০ সে.মি.	৫৫-৬৩ সে.মি.
প্রাথমিক শাখার সংখ্যা	৩-৫	৩-৫	৩-৫টি	৩-৫টি	৩-৫টি	২-৪টি
প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা	৪৫-৬০টি	৩০-৬০টি	৫০-৬০টি	৪৫-৫৫টি	৪৫-৬০টি	৪৬-৬০টি
প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা	২-৩টি	২-৩টি	২-৩টি	২-৩টি	২-৩টি	২-৩টি
১০০ বীজের ওজন	১১.৫-১৩.০ গ্রাম	১৩.০-১৩.৮ গ্রাম	১২.০-১৩.০ গ্রাম	১৩.৮-১৪.৩ গ্রাম	১৩.০ - ১৩.৮ গ্রাম	১১.০ - ১৩.৫ গ্রাম
বীজে আমিষের পরিমাণ	৪৪.৫%	৪৩%	৪২.৫%	৪৩.৫%	৪৩%	৪৪%
বীজে তেলের পরিমাণ	১৮%	১৯%	২০%	১৯%	২০%	২০%
বীজে শর্করার পরিমাণ	২৭%	২৭%	২৬%	২৭%	২৭%	২৬%
জীবনকাল (দিন)	রবি: ১০৫-১১০ খরিফ-২: ৯৫-১০৫	রবি: ৯৫-১০৫ খরিফ-২: ১১০-১১৫	রবি: ১১০-১১৫ খরিফ-২: ১০৫-১১০	রবি: ১১৫-১২০ খরিফ-২: ১১০-১১৫	রবি: ১০০-১০৫ খরিফ-২: ১১০-১১৫	রবি: ৯৫-১০৫ খরিফ-২: ১১০-১১৫
ফলন (টন/হেক্টর)	রবি: ২.৪-২.৭ খরিফ-২: ২.৫-৩.০	রবি: ২.৪-২.৮ খরিফ-২: ২.৭-৩.৩	রবি: ২.৫-৩.২ খরিফ-২: ২.৪-৩.০	রবি: ২.৪-২.৭ খরিফ-২: ২.৫-৩.০	রবি: ২.৪-৩.০ খরিফ-২: ২.৫-৩.৩	রবি: ২.৫-৩.১ খরিফ-২: ২.৫-৩.২

সয়াবিনের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

এ দেশের মাটি এবং আবহাওয়ায় রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই সয়াবিন চাষ করা যায়। বেলে দো-আঁশ হতে দো-আঁশ মাটি সয়াবিন চাষের জন্য বেশী উপযোগী। খরিফ বা বর্ষা মৌসুমে চাষের জন্য নির্বাচিত জমি অবশ্যই উঁচু ও পানি নিষ্কাশনযোগ্য হতে হবে। রবি মৌসুমে মাঝারি থেকে নিচু জমিতে চাষ করা যায়। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ভোলা, যশোর এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল জাতগুলি চাষের জন্য উপযোগী।

জমি তৈরি

মাটির প্রকারভেদে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে এবং আগাছামুক্ত করে বীজ বপন করতে হবে। মই দিয়ে জমি সমান করার পর সুবিধামতো আকারে পট তৈরি করে নিলে পরবর্তীতে সেচ প্রয়োগ, পানি নিষ্কাশন ও আন্ত:পরিচর্যা বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

বপনের সময়

রবি ও খরিফ-২ উভয় মৌসুমেই সয়াবিন চাষ করা যায়। রবি মৌসুমে পৌষের প্রথম থেকে মাঘ মাসের মাঝামাঝি (ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারীর শেষ) পর্যন্ত এবং খরিফ-২ মৌসুমে শ্রাবনের প্রথম থেকে ভাদ্র মাসের শেষ (মধ্য জুলাই হতে মধ্য সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার

বপন পদ্ধতি	বীজের হার (কেজি)											
	বিনাসয়াবিন-১		বিনাসয়াবিন-২		বিনাসয়াবিন-৩		বিনাসয়াবিন-৪		বিনাসয়াবিন-৫		বিনাসয়াবিন-৬	
	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি
সারিতে বপন	৪৫	১৮	৫৫	২২	৪৫	১৮	৪৫	১৮	৫৫	১৮	৪৫	২২
ছিটিয়ে বপন	৫৫	২২	৭০	২৮	৫৫	২২	৫৫	২২	৭০	২২	৫৫	২৮

বীজ শোধন

বীজ বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নেয়া ভাল। এজন্য প্রতি কেজি বীজে ২-৩ গ্রাম প্রোভ্যাক্স-২০০ বা ক্যাপ্টান ব্যবহার করা যেতে পারে।

বপন পদ্ধতি

বীজ সারিতে বপন করা উত্তম। তবে মাসকলাই বা মুগ ডালের মতো ছিটিয়েও বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দুরত্ব রবি মৌসুমে ৩০ সে.মি. বা ১২ ইঞ্চি দিতে হবে। সারিতে ২.৫-১০.০ সে.মি. বা ১-৪ ইঞ্চি গভীরে বীজ বপন করতে হয়। ছিটিয়ে বপন করলে চাষের পর বীজ ছিটিয়ে মই দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ঝুরঝুরে এবং ফিল্ড ক্যাপাসিটি পর্যায়ে থাকলে বীজ বেশী গভীরে এবং কাদা মাটি হলে বীজ অল্প গভীরতায় দিলেই গজাবে।

সারের পরিমাণ

কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভেদে সারের মাত্রা বিভিন্ন রকম হয়। নিম্নে সয়াবিন চাষের জন্য সাধারণভাবে অনুমোদিত সারের মাত্রা উল্লেখ করা হলো। শেষ চাষের পূর্বে সব রাসায়নিক সার ছিটিয়ে মই দিয়ে মাটি সমান করতে হবে।

সারের নাম	*হেক্টর প্রতি কেজি*	*একর প্রতি কেজি*
ইউরিয়া	*৫০-৬০*	*২০-২৫*
টিএসপি	*১৫০-১৭৫*	*৬০-৭০*
এমওপি	*১০০-১২০*	*৩৫-৪০*
জিপসাম	*৮০-১১৫*	*৩০-৩৫*
জিংক সালফেট	*৪-৬*	*১.৬-২.৪*
বরিক এসিড	*৮-১০*	*৩.০-৪.০*
জীবানুসার (ইউরিয়ার পরিবর্তে)	*২০-৩০ গ্রাম (প্রতি কেজি বীজের জন্য)*	

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

বপনের পূর্বে বীজে জীবাণুসার মিশিয়ে বপন করলে গাছের শিকড়ে নডিউল বা গুটি সহজে সৃষ্টি হয়। শিকড়ে সৃষ্ট এ নডিউল থেকে গাছ নাইট্রোজেন পায়। এক কেজি সয়াবীন বীজে ২০-৩০ গ্রাম চিটাগুড় ভালোভাবে মিশানোর পর ২০-৩০ গ্রাম জীবাণুসার মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে চিটাগুড় মিশ্রিত আঠালো বীজের গায়ে জীবাণুসার সমভাবে লেগে যায়। জীবাণুসার মিশানোর পর বীজ তাড়াতাড়ি বপন করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা

চারা গজানোর ১৫-২০ দিনের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গাছ খুব ঘন হলে পাতলা করে দিতে হবে এবং সারিতে গাছ হতে গাছের দূরত্ব রাখতে হবে ২.৫-৪.০ ইঞ্চি। তবে প্রতি বর্গ মিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৫৫টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪৫-৫০টি গাছ রাখা উত্তম। রবি মৌসুমে গাছে ফুল ধরা এবং ফল বা শুঁটি ধরার সময় সম্পূরক সেচের প্রয়োজন হতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

বিছাপোকা ও পাতা মোড়ানো পোকা : বিছাপোকা ও পাতা মোড়ানো পোকা সয়াবিনের মারাত্মক ক্ষতি করে। ডিম থেকে ফোটার পর ছোট অবস্থায় বিছাপোকার কিড়াগুলো একস্থানে দলবদ্ধভাবে থাকে এবং পরবর্তীতে আক্রান্ত গাছের পাতা খেয়ে জালের মতো পাতা ঝাঁঝরা করে ফেলে। এ পোকা দমনের জন্য আক্রান্ত পাতা পোকাসহ তুলে মেরে ফেলতে হবে। পাতা মোড়ানো পোকার কীড়া পাতা ভাঁজ করে ভিতরে অবস্থান করে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। উভয় পোকার আক্রমণ বেশি হলে সেভিন ৮৫ এসপি

৩৪ গ্রাম পাউডার প্রতি ১০ লিটার পানিতে অথবা এডভান্টেজ ২০ এসসি ৩০ মি.লি. প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।

কান্ডের মাছি পোকা : এ পোকার কীড়া কান্ড ছিদ্র করে ভিতরের নরম অংশ খেয়ে ফেলে, ফলে আক্রান্ত গাছ দ্রুত মরে যায়। এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হলে ডায়াজিনন ৬০ ইসি ২৫-৩০ মি.লি. প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত জমিতে স্প্রে করতে হবে।

হলুদ মোজাইক ভাইরাস : সয়াবিনের সবুজ পত্রফলকের উপরিভাগে উজ্জ্বল সোনালী বা হলুদ রঙের চক্রাকার দাগের উপস্থিতি এ রোগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সুস্থ্য এবং রোগমুক্ত বীজ বপনের মাধ্যমে এ রোগের আক্রমণ অনেকটা কমানো যায়। উল্লেখ্য যে, বিনা উদ্ভাবিত সকল জাতই হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল।

কান্ড পঁচা রোগ : মাটিতে অবস্থানকারী ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং কান্ড ও মূলে কালো দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত চারা বা গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরে যায়। গভীর চাষ এবং জমি হতে ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, আগাছা ও আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলে এ রোগের উৎস নষ্ট করা যায়।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও বীজ সংরক্ষণ

পরিপক্ক অবস্থায় সয়াবিন গাছ শুঁটিসহ হলুদ হয়ে আসলে এবং পাতা ঝরে গেলে মাটির উপর হতে কেটে সংগ্রহ করতে হবে। সয়াবিন গাছ রোদে ৩-৪ দিন শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ আলাদা করতে হবে। বীজ রোদে ভালো করে শুকিয়ে ঠান্ডা করে গুদামজাত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সয়াবিনের অংকুরোদগম ক্ষমতা সাধারণ অবস্থায় বেশি দিন বজায় থাকে না। তাই সংরক্ষণের ২-৩ মাস পরই বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা কমতে শুরু করে। তাই পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহারের জন্য বীজ সংরক্ষণ করতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

- মাড়াই করার পর বীজ বিশেষ যত্নসহকারে শুকাতে হবে। যদি রোদের উত্তাপ খুব প্রখর হয় তবে বীজ একটানা তিন থেকে চার ঘন্টার বেশি রোদে শুকানো ঠিক নয়। কারণ কড়া রোদে অনেকক্ষণ ধরে বীজ শুকালে অংকুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রতিদিন অল্প সময় করে অর্থাৎ দুই থেকে তিন ঘন্টা করে কয়েক দিন শুকাতে হবে। শীতকালে যখন রোদের তাপ কম থাকে তখন একটানা চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ধরে শুকালেও কোন ক্ষতি হয় না। সয়াবিন বীজ সরাসরি সিমেন্টের তৈরি পাকা খোলায় না শুকিয়ে ত্রিপল বা চাটাইয়ের উপর শুকাতে হবে। বীজ এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে বীজের আর্দ্রতা ৯% এর বেশি না থাকে। শুকানো বীজ দাঁত দিয়ে কামড় দিলে ‘কট’ শব্দ করে বীজ ভেঙে গেলে বুঝতে হবে যে বীজ ভালোভাবে শুকিয়েছে।
- শুকানোর পর বীজ ভালোভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং রোগাক্রান্ত পঁচা বীজ বেছে ফেলে দিতে হবে।
- বীজ সংরক্ষণের পূর্বে এর অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- বীজ রাখার জন্য পলিথিনের ব্যাগ, প্লাষ্টিক বা টিনের ড্রাম, আলকাতরা মাখা মাটির মটকা বা কলসী, বিস্কুটের টিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মোটা পলিথিনের ব্যাগে বীজ রেখে মুখ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে তা আবার একটি চটের বস্তায় ভরে রাখলে ভালো হয়। পলিথিনের ব্যাগ, প্লাষ্টিক বা ধাতব পাত্র যাই হোক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এর মুখ ভালোভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে যেন কোনভাবেই ভিতরে বাতাস ঢুকতে না পারে। বীজ শুকানোর পর গরম অবস্থায় সংরক্ষণ না করে ঠান্ডা হলে সংরক্ষণ করতে হবে।

বীজের পাত্র অবশ্যই ঠান্ডা অথচ শুষ্ক জায়গায় রাখতে হবে এবং সরাসরি মেঝেতে না রেখে মাচা বা কাঠের তৈরি পাটাতনের উপর রাখলে ভালো হয়। কোন কারনে বীজের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে প্রয়োজনমতো রোদে শুকিয়ে নিতে হবে এবং পূর্বের ন্যায় একই নিয়মে পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

ডাল ফসল

স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অতি জনপ্রিয় আমিষ সমৃদ্ধ খাবার ডাল ফসল চাষাবাদ হয়ে আসছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ডাল ফসলগুলির মধ্যে আছে মসুর, মুগ, ছোলা, খেসারী ও মাষকলাই। দেশীয় খাবার ডাল উৎপাদনের ৯৫ ভাগ আসে এ পাঁচটি ডাল ফসল থেকে। মুগ ব্যাতিত অন্যান্য ডাল ফসল শীতকালে আবাদ করা হয়। পক্ষান্তরে মুগের চাষ হয় শীত ও গ্রীষ্মকালে। ডাল শস্য চাষাবাদে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার খুবই কম। ফলে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার জনিত পরিবেশ দূষণ হয় না। উপরন্ত, ডাল শস্য কেবল মাটির স্বাস্থ্যই ভাল করে না, মানুষের স্বাস্থ্য গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ ডাল ফসল আবাদ করলে মাটির গঠন, বাতাস চলাচল ক্ষমতা ও উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মুগ, ছোলা বা অন্য কোন ডাল ফসল আবাদের ফলে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ২০-৬০ কেজি বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন যোগ হতে পারে, যা পরবর্তী ফসলের বৃদ্ধি বিকাশে সহায়ক হতে পারে। উল্লেখ্য, এই সকল ফসলের শিকড়ে এক ধরনের স্ফীতকায় নডিউল জন্মে, এগুলি বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ও সংরক্ষণ করতে পারে। আমাদের যে সকল খাদ্য শস্য আছে তার মধ্যে ডাল ফসলের বীজ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ আমিষ পাওয়া যায়। আমিষের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লাইসিন অ্যামাইনো এসিড বিদ্যমান থাকে যা ভাতে থাকে না। ফলে ভাতের সাথে ডাল খেলে খাবার পুষ্টিকর হয়। ডাল খনিজ লবন (K,P,Fe,Zn) ও ভিটামিন এর উৎকৃষ্ট উৎস। গঙ্গা বিধৌত উত্তরাঞ্চলীয় জেলা (পাবনা, রাজশাহী), বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় কিছু কিছু এলাকায় (বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, খুলনা) ডাল শস্যের আবাদ করা হয়। এ সকল স্থানের মাটি ক্যালকেরিয়াস ধরনের, দো-আঁশ এবং কর্দমাক্ত। এখানে ফসফরাস, মলিবডেনাম, ক্যালসিয়াম ও বোরন জাতীয় উপাদানের আধিক্য থাকায় ডাল শস্য আবাদ করার ভাল সুযোগ আছে।

মসুর

মসুর বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান একটি ডাল ফসল। মসুর গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না তবে এটি কিছুটা খরা সহিষ্ণু। পুষ্টির দিক বিবেচনা করলে মসুর ডালে প্রোটিন এর পরিমান ১৯-৩৫%। এটি সুস্বাদু এবং সুপাচ্য হওয়ায় সারা বাংলাদেশে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এটির অন্তর্ভূক্তি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এ পর্যন্ত ১১টি মসুরের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে সেগুলো হলো- বিনামসুর-১, বিনামসুর-২, বিনামসুর-৩, বিনামসুর-৪, বিনামসুর-৫, বিনামসুর-৬, বিনামসুর-৭, বিনামসুর-৮, বিনামসুর-৯, বিনামসুর-১০ এবং বিনামসুর-১১।

বিনামসুর-১

বিনামসুর-১ জাত পাবনার স্থানীয় জাতের বীজে ধুতুরার নির্যাস প্রয়োগ করে মিউটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে বংশগত ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন এনে এই জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ২০০১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সারাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য বিনা মসুর-১ নামে নিবন্ধন করা হয়।

এ জাতে গাছের কান্ড বহুশাখা বিশিষ্ট, গোড়া তাম্রবর্ণের, ঝোপালো। পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের। বীজের আবরণ কালো বর্ণের যা সহজেই বীজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সহায়তা করে। বীজ বপন থেকে কাটা পর্যন্ত ১২৫-১৩০ দিন সময় লাগে। হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.৭-২.০ টন (গড় ফলন ১.৮ টন)। ১০০০ বীজের ওজন ১৫.৫ গ্রাম।

মাঠে বিনামসুর-১

বিনামসুর-১ এর বীজ

বীজে প্রোটিন ও ডালের পরিমাণ যথাক্রমে ২৫.৯% ও ৮৯.৬১%। এই জাতটি মরিচা ও পাতা ঝলসানো রোগ সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন। খেতে সুস্বাদু এবং রান্না করলে সহজেই সিদ্ধ হয়।

বিনামসুর-২

উৎফলা জাতের বীজে ২০০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মসুরের এই জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ২০০৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এটিকে বাণিজ্যিকভাবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

এ জাতটি আগাম, অধিক ফলনশীল। এই গাছের কান্ড মধ্যম শাখা-প্রশাখাযুক্ত, গাছটি উচ্চতায় ৩৫-৪০ সে.মি. লম্বা হয় এবং পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের। বীজ এর আবরণ ধুসর বর্ণের, শস্য দানা লালচে। এর জীবনকাল ৯৮-১০১ দিন। এক হাজার বীজের ওজন ১৬-১৭ গ্রাম। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১৯৯০ কেজি। এটি মরিচা রোগ মাঝারি সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন।

মাঠে বিনামসুর-২

বিনামসুর-২ এর বীজ

এতে প্রোটিনের পরিমাণ ২৩-২৫%, খেতে সুস্বাদু এবং রান্না করলে ভালভাবে সিদ্ধ হয়।

বিনামসুর-৩

L-5 নামক একটি স্থানীয় জাতের বীজে ইথাইল মিথেন সালফোনেট (ইএমএস) প্রয়োগ করে এর বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন এনে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ২০০৫ সালে এ জাতটি বিনামসুর-৩ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয় ।

এ জাতের গাছের উচ্চতা ৩৪-৩৮ সে.মি.। কান্ড মধ্যম শাখা বিশিষ্ট, গোড়া গোলাপী বর্ণের ও গাছ খাড়া, পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের ও আকর্ষিযুক্ত। বীজের আবরন ধুসর বর্ণের।

বিনামসুর-৩ এর জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন। ফলন ক্ষমতা ২৪০০ কেজি/হেক্টর এবং গড় ফলন ১৮০০ কেজি/হেক্টর। এক হাজার বীজের ওজন ২০.১১ গ্রাম। এটি সুস্বাদু এবং বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ২৫.০% এবং বীজে ডালের পরিমাণ ৯০.৬১% এই জাতটি মরিচা ও গোড়াপঁচা রোগসহনশীল এবং স্বল্প মাত্রার খরা সহিষ্ণু।

মাঠে বিনামসুর-৩

বিনামসুর-৩ এর বীজ

বিনামসুর-৪

এই জাতটিও L-5 নামক একটি স্থানীয় জাতের বীজে ইথাইল মিথেন সালফোনেট (ইএমএস) দ্রবণ প্রয়োগ করে এর বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন এনে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ২০০৯ সালে এটি E4M-934 বিনামসুর-৪ হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয় ।

গাছের উচ্চতা ৩৫-৪০ সে.মি. কান্ড মধ্যম শাখাবিশিষ্ট, গোড়া সাদা বর্ণের ও গাছ খাড়া, পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের, বীজ এর আবরন ধুসর। জীবনকাল ৯৬-১০২ দিন। বিনামসুর-৪ এর প্রতি হেক্টরে গড় ফলন ১৮০০ কেজি। এক হাজার বীজের ওজন ২১.৩ গ্রাম। এটি খেতে সুস্বাদু, বীজে প্রোটিন এর পরিমাণ ২৫% এবং বীজে ডালের পরিমাণ ৯০.৬%।

মাঠে বিনামসুর-৪

বিনামসুর-৪ এর বীজ

এ জাতটি মরিচা ও গোড়াপঁচা রোগ সহনশীল এবং খরা সহিষ্ণু জাত হিসেবে বরেন্দ্র এলাকায় চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

বিনামসুর-৫

২০১১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনামসুর-৫ নামে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়। ২০০২ সালে বারিমসুর-৪ জাতের বীজে ২০০ গ্রে মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রবি মৌসুমের উপযোগী এই আগামপাকা ও উচ্চ ফলনশীল মিউট্যান্ট লাইন এলএম-৭৯-৫ পাওয়া যায়। এই জাতটি স্টেমফাইলাম ব্লাইট, মরিচা ও গোড়াপচা রোগ সহনশীল।

এই জাতটির গাছের উচ্চতা ৩৬-৪০ সে.মি.। কান্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, গোড়া হালকা সবুজ বর্ণের ও গাছ খাড়া, পাতা গাড় সবুজ বর্ণের, আকর্ষিযুক্ত। এটির বীজের আবরণ ধূসর বর্ণের। বীজের আকার স্থানীয় জাত হতে বড় ও চ্যাপ্টা। এর জীবনকাল ৯৯-১০৪ দিন। গড় ফলন ২১৫০ কেজি/হেক্টর। এক হাজার বীজের ওজন ২২-২৪ গ্রাম। বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ২৯.৩৮-২৯.৫৩% এবং ডালের পরিমাণ ৮৯%। এটি সুপাচ্য ও সুস্বাদু।

মাঠে বিনামসুর-৫ ইনসেটে বীজ

বিনামসুর-৬

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০০২ সালে বারিমসুর-৪ জাতের বীজে ২৫০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রবি মৌসুম উপযোগী একটি মিউটেন্ট লাইন এলএম-১১৫-৭ নির্বাচন করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এই মিউটেন্ট লাইনটি ২০১১ সালে বিনামসুর-৬ নামে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

এই জাতের গাছের উচ্চতা ৩৮-৪২ সে.মি.। কান্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, গোড়া সবুজ বর্ণের ও গাছ খাড়া। পাতা গাঢ় সবুজ ও আকর্ষিযুক্ত, বীজের আবরণ ধূসর বর্ণের ও বীজের আকার মাঝারি। বিনামসুর-৬ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত এবং রাস্ট এবং ব্লাইট রোগ সহনশীল। এই জাতটি হেক্টর প্রতি ১৯৫০ কেজি ফলন দেয়, এর জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। বীজে ক্রুড প্রোটিনের পরিমাণ ৩০.৫৩-৩১.০০% এবং ডালের পরিমাণ ৮৮%। ডালের রং লাল এবং সুস্বাদু।

মাঠে বিনামসুর-৬ ইনসেটে বীজ

বিনামসুর-৭

২০০৬ সালে ICARDA থেকে ১৫০ টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষণের পর এলজি-৫৮ লাইনটি ২০১৩ সালে সারা দেশে আবাদের জন্য বিনামসুর-৭ নামে নিবন্ধন করা হয় ।

উচ্চ ফলনশীল মসুর জাত। পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের আকর্ষিযুক্ত। ফুল বেগুনী এবং বীজাবরণ ধুসর বর্ণের। বীজের আকার স্থানীয় জাত হতে বড় ও চ্যাপ্টা। এ জাতটি গোড়াপচাঁ রোগ সহনশীল। ডাল সহজে সিদ্ধ হয় এবং সুস্বাদু। ১০০০ বীজের ওজন ২১.৫ গ্রাম। বীজে ডালের পরিমাণ ৮৮%। জীবনকাল ১১০-১১২ দিন। যথোপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টর প্রতি গড়ে ২.০ টন এবং সর্বোচ্চ ২.২ টন ফলন পাওয়া যায়। এ জাতটি বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

বিনামসুর-৭ এর বীজ

বিনামসুর-৮

বারিমসুর-৪ এ ২০০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ২০১৪ সালে এলএম-৭৫-৪ মিউটেন্ট কৃষক পর্যায়ে আবাদের জন্য বিনামসুর-৮ নামে নিবন্ধন করা হয়।

উচ্চ ফলনশীল জাত। কান্ড বহুশাখা বিশিষ্ট ও গাছ খাড়া। বীজাবরণ ধুসর বর্ণের। বীজের আকার প্রচলিত জাত হতে বড় ও চ্যাপ্টা। ডাল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। ১০০০ বীজের ওজন ২৩-২৫ গ্রাম, বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ২৯-৩০% এবং বীজে ডালের পরিমাণ ৯০%। জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন। যথোপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টর প্রতি গড়ে ২.৪ টন এবং সর্বোচ্চ ২.৬ টন ফলন পাওয়া যায়।

মাঠে বিনামসুর-৮

বিনামসুর-৮ এর বীজ

বিনামসুর-৯

বারিমসুর-৪ এ ২০০ গ্রে মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ২০১৪ সালে কৃষক পর্যায়ে আবাদের জন্য এলএম-১৩২-৭ লাইনটি বিনামসুর-৯ নামে নিবন্ধন করা হয়।

উচ্চ ফলনশীল জাত। কান্ড বহু শাখা বিশিষ্ট ও গাছ খাড়া। বীজাবরণ ধুসর বর্ণের, বীজের আকার প্রচলিত জাত হতে বড় ও চ্যাপ্টা। ডাল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। ১০০০ বীজের ওজন ২২-২৩ গ্রাম, বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ৩২-৩৩% এবং ডালের পরিমাণ ৮৯%। জীবনকাল ৯৯-১০০ দিন। যথোপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টর প্রতি গড়ে ২.৩ টন এবং সর্বোচ্চ ২.৪ টন ফলন পাওয়া যায়।

মাঠে বিনামসুর-৯

বিনামসুর-৯ এর বীজ

বিনামসুর-১০

২০০৬ সালে ICARDA থেকে ১৫০টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষণের পর ২০১৬ সালে সারা দেশে আবাদের জন্য এলজি-২০৮ লাইনটিকে বাংলাদেশে প্রথম খরা সহিষ্ণু এবং উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। এ জাতটি বাংলাদেশের খরা প্রবণ অঞ্চলসমূহ তথা রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে বেশী ভাল হয়।

এ জাতটি খরা সহিষ্ণু এবং উচ্চ ফলনশীল। কান্ড বহু শাখাবিশিষ্ট এবং গাছের গোড়া গাঢ় সবুজ বর্ণের। বীজাবরণ ধুসর বর্ণের এবং বীজের আকার বড়। ডাল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। ১০০০ বীজের ওজন ২৪.৬ গ্রাম। জীবনকাল ১০৮-১১০ দিন ও বীজে ডালের পরিমাণ ৮৯%। যথোপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টর প্রতি খরা অবস্থায় ১.৫ টন এবং স্বাভাবিক অবস্থায় গড়ে ২.২ টন ফলন পাওয়া যায়।

মাঠে বিনামসুর-১০

বিনামসুর-১০ এর বীজ

বিনামসুর-১১

২০০৬ সালে বারিমসুর-৪ এ ২০০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ২০১৭ সালে কৃষক পর্যায়ে আবাদের জন্য এ জাতটি নিবন্ধন করা হয়।

এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল। গাছের উচ্চতা ৩৮-৪২ সে.মি.। কান্ড বহু শাখাবিশিষ্ট এবং গাছের গোড়া গাঢ় সবুজ বর্ণের। বীজাবরণ ধুসর বর্ণের। ডাল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। ১০০০ বীজের ওজন ২১ গ্রাম। জীবনকাল ১০৮-১১০ দিন এবং বীজে ডালের পরিমাণ ৮৮%। ডাল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। যথোপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টর প্রতি গড়ে ২.১ টন এবং সর্বোচ্চ ২.৩ টন ফলন পাওয়া যায়।

মাঠে বিনামসুর-১১

বিনামসুর-১১ এর বীজ

মসুরের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন
দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটি মসুর চাষের জন্য উপযোগী। তবে ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা, রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলায় মসুরের চাষাবাদ ভাল হয়।

জমি তৈরি
তিন-চারটি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। জমি উত্তমরুপে ঝুর ঝুরে করে নেয়া ভাল।

বপনের সময়
কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়নের প্রথম (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। বিলম্বে বীজ বপন করলে ফলন হ্রাস পায়।

বীজ হার
ছিটিয়ে বপন করলে একর প্রতি ১৪-১৬ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। তবে সারিতে বপন করলে একর প্রতি দুই কেজি বীজ কম লাগে। হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি প্রয়োজন। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমান সামান্য বেশি (৩৫-৪০) কেজি দিতে হয়।

বীজ শোধন
গোড়াপঁচা রোগ দমনের জন্য প্রোভ্যাক্স-২০০, প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বপন পদ্ধতি
সাধারণত: চাষ করা জমিতে বীজ ছিটিয়ে বোনার পর মই দিয়ে বীজগুলো ঢেকে দিতে হবে। সারিতে বপন করলে পরিচর্যা করা সহজ হয়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দুরত্ব ৩০ সে.মি. (১ ফুট) এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪-৫ সেন্টিমিটার রাখতে হবে। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে ৩-৪ সে.মি. গভীর করে বীজ বপন করতে হয়।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	
	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি
ইউরিয়া	৩০-৩৫	১২-১৪
টিএসপি	৮০-৯০	৩২-৩৬
এমওপি	৩০-৩৫	১২-১৪
জিপসাম	২৫-৩০	১০-১২
জিংক সালফেট	২.৫	১.০
জীবাণু সার (ইউরিয়ার পরিবর্তে)	১.৫০	০.৬০
বোরন	৪.০	২.০

জমিতে জীবাণু সার দিলে ইউরিয়া সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি
জমিতে শেষ চাষের সময় উক্ত পরিমাণ সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পানি সেচ
মসুরে সাধারণত: সেচের প্রয়োজন পড়ে না। তবে অতি খরা হলে একটি হালকা সেচ দেয় যেতে পারে। সেচের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পানি জমে না থাকে, তাহলে মসুর এর গোড়া পঁচে মরে যাবে।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা
চারা গজানোর পর ২৫-৩০ দিন পর নিড়ানী দিতে হবে এবং নিড়ানীর সাথে বেশি ঘন গাছ পাতলা করে দিতে হবে। অতি বৃষ্টির ফলে জমিতে যাতে পানি জমে না থাকে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় দমন
গোড়াপচাঁ, স্টেমফাইলাম ব্লাইট ও মরিচা রোগ তিনটি প্রধান রোগ। এর মধ্যে গোড়াপঁচা রোগ দমনের জন্য প্রোভ্যাক্স-২০০ প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। স্টেমফাইলাম ব্লাইট জনিত ঝলসানো রোগ দেখা দেওয়া মাত্র রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি অথবা এমষ্টারটপ নামক ছত্রাকনাশক ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। তাছাড়া জাবপোকার আক্রমন দেখা দিলে কীটনাশক রিপকর্ড-১০ ইসি মাত্রা অনুযায়ী স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ
ফল পেকে গেলে গাছগুলো গোড়া থেকে তুলে অথবা কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে হবে। গোড়া থেকে কেটে নিলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাছগুলো ভালভাবে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। এই বীজ ডাল অথবা বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তবে বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে হলে আরও ভালভাবে রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতার পরিমাণ আনুমানিক ৯-১০% এর মত রাখলে ভাল হবে। তারপর আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া মাটির পাত্রে বা টিনের পাত্রে মোটা পলিথিনে মুড়িয়ে বস্তায়/ড্রামে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষিত বীজ শুষ্ক পরিবেশে উঁচু ও ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে। সংরক্ষিত স্থান সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণ না হয়।

মুগ

বাংলাদেশে যে সকল ডাল ফসল চাষ করা হয়, তার মধ্যে মুগ (*Vigna radiata* L. *Wilczek*) অন্যতম প্রধান ফসল। মুগডালের বিশেষ গুণ হলো রান্না করা ডাল সহজপ্রাচ্য, সুগন্ধযুক্ত এবং আমিষ সমৃদ্ধ। দেশে বৎসরে প্রায় ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে মুগ চাষ করা হয়। বাৎসরিক ডাল উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫,০০০ মে.টন। দেশের বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, মাগুরা, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া ও দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় মুগের আবাদ করা হয়। শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মুগ চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ এই ফসলের জীবনকাল কম। ধান ভিত্তিক শস্য পরিক্রমায় সহজেই মুগ চাষ করা যেতে পারে। বিনা থেকে এ পর্যন্ত মুগ ডালের ১০টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি শীতকালে এবং পাঁচটি গ্রীষ্মকালে আবাদ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। জাত গুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলো।

বিনামুগ-১ (শীতকালীন জাত)

দেশীয় ও বৈদেশিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৭৭ সনে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছু বীজ সংগ্রহ করা হয়। তারপর সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে এমবি-৫৫ লাইনটিকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ১৯৯২ সনে উক্ত লাইনটিকে বিনামুগ-১ নামে শীতকালে কৃষক পর্যায়ে বানিজ্যিকভাবে চাষ করার জন্য নিবন্ধন করা হয়।

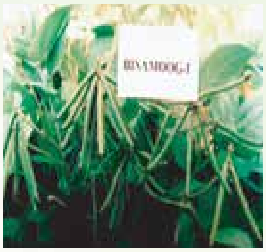

মাঠে বিনামুগ-১

বিনামুগ-১ এর বীজ

বিনামুগ-২ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

এমবি-৫৫ লাইনে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ছোট আকারের বীজ বিশিষ্ট মিউট্যান্ট লাইন, এমবি-৫৫(৪) এবং এভিআরডিসি, তাইওয়ান থেকে সংগৃহীত একটি জার্মপ্লাজম লাইন, ডি-২৭৭৩ এর মধ্যে সংকরায়ণ করে পরবর্তী বৎসর গুলোতে বাছাই ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিনামুগ-২ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এই জাতটি ১৯৯৪ সনে নিবন্ধন করা হয়।

বিনামুগ-২ এর বীজ

বিনামুগ-৩ ও বিনামুগ-৪ (শীতকালীন জাত)

গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোট আকারের বীজ বিশিষ্ট মুগ ডালের মিউট্যান্ট লাইন এমবি-৫৫(৪) এবং বিদেশী (এভিআরডিসি) লাইন (ভিসি-১৫৬০ডি) এর মধ্যে সংকরায়ণ করে এই জাত দুটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ সালে জাত দুটোকে বিনামুগ-৩ এবং বিনামুগ-৪ নামে শীতকালে কৃষক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার জন্য নিবন্ধন করা হয়।

মাঠে বিনামুগ-৪

বিনামুগ-৪ এর বীজ

সারণী-১ শীতকালীন জাত তিনটির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	বিনামুগ-১	বিনামুগ-৩	বিনামুগ-৪
গাছের উচ্চতা (সে.মি.)	৩৫-৫০	৩২-৩৪	২৮-৩০
পাতার রং	গাঢ় সবুজ	হালকা সবুজ	গাঢ় সবুজ
বীজের রং	হলুদ, অমসৃণ	সবুজ, অমসৃণ	সবুজ, মসৃণ
বীজের আকার	মধ্যম আকৃতির	মধ্যম আকৃতির	মধ্যম আকৃতির
পডের আবরণ এবং আকার	সমান ও সরু	সমান, নিচ দিকে বাঁকা	ঢেউ খেলানো, উপর দিকে বাঁকা
১০০ বীজের ওজন (গ্রাম)	৩.০-৩.৫	৩.৬-৩.৭	৩.৮-৩.৯
জীবনকাল (দিন)	৯০-৯৫	৮০-৮৫	৭৫-৮৫
হেক্টর প্রতি গড় ফলন (কেজি)	৯০০	১০২৫	১০৭৫

বিনামুগ-৫ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

এমবি-৫৫ লাইনে গামা-রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবিত ছোট আকারের বীজ বিশিষ্ট মিউট্যান্ট লাইন এমবি-৫৫(৪) এবং এভিআরডিসি, তাইওয়ান থেকে সংগৃহীত একটি জার্মপ্লাজম লাইন, ভিসি-১৫৬০ডি এর মধ্যে সংকরায়ণ করে পরবর্তী বৎসরগুলিতে বাছাই ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিনামুগ-৫ উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এই জাতটি ১৯৯৮ সনে নিবন্ধন করা হয়।

মাঠে বিনামুগ-৫

বিনামুগ-৫ এর বীজ

বিনামুগ-৬ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

তাইওয়ান থেকে সংগৃহীত ছোট আকার বিশিষ্ট বীজে ১৯৯৬ সালে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছরগুলোতে বাছাই ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমে চাষ উপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিনামুগ-৬ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এই জাতটি ২০০৫ সালে নিবন্ধন করা হয়।

মাঠে বিনামুগ-৬

বিনামুগ-৬ এর বীজ

বিনামুগ-৭ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

বিনামুগ-২ এর বীজে রাসায়নিক মিউটাজেন, ইথাইল মিথেন সালফোনেট (ইএমএস) দ্রবণ প্রয়োগ করে মিউটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে একটি মিউট্যান্ট E4I-901 উদ্ভাবন করা হয়, যা ২০০৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনামুগ-৭ হিসেবে দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন লাভ করে।

মাঠে বিনামুগ-৭

বিনামুগ-৭ এর বীজ

বিনামুগ-৮ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

আলো নিরপেক্ষ, উচ্চ ফলনশীল ও মধ্যম আকারের হলুদ বীজ সম্পন্ন এমবি-১৪৯ লাইনে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছর গুলোতে বাছাই ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমবিএম-০৭ মিউট্যান্টটি উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত মিউট্যান্টটি উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাত হিসেবে খরিফ-১ মৌসুমে দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনামুগ-৮ নামে ২০১০ সালে নিবন্ধন লাভ করে।

মাঠে বিনামুগ-৮

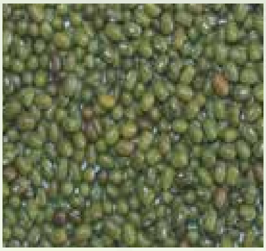

বিনামুগ-৮ এর বীজ

বিনামুগ-৯ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

বারিমুগ-৬ বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছর গুলোতে বাছাই ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমবিএম-৩৪৭-১৩ মিউট্যান্টটি উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত মিউট্যান্টটি উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাত হিসেবে খরিফ-১ মৌসুমে দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনামুগ-৯ নামে ২০১৭ সালে নিবন্ধন লাভ করে।

মাঠে বিনামুগ-৯

বিনামুগ-৯ এর বীজ

বিনামুগ-১০ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

বারিমুগ-৬ বীজে ২০১২ সালে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছর গুলোতে বাছাই ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন চাষ উপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিনামুগ-১০ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এমবিএম-৪২৭-৮৭-৩ মিউট্যান্টটি উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাত হিসেবে খরিপ-১ মৌসুমে দেশব্যাপী কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনামুগ-১০ নামে ২০২০ সালে নিবন্ধন লাভ করে।

মাঠে বিনামুগ-১০

বিনামুগ-১০ এর বীজ

সারণী-২: গ্রীষ্মকালীন জাতগুলোর (বিনামুগ-২, বিনামুগ-৫ এবং বিনামুগ-৬) তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	বিনামুগ-২	বিনামুগ-৫	বিনামুগ-৬
পরিপক্ক	প্রায় ৮০% ফল প্রায় একই সঙ্গে পাকে	প্রায় ৮০% ফল প্রায় একই সঙ্গে পাকে	প্রায় ৮০% ফল প্রায় একই সঙ্গে পাকে
জীবনকাল	৭০-৮০ দিন	৭০-৮০ দিন ফলগুলো গাছের উপরিভাগে থাকে এবং লম্বা যা তুলতে সুবিধা হয়	৬৪-৬৮ দিন
বীজের আকার ও রং	বীজের আকার মাঝারি এবং রং ঘোলাটে সবুজ	বীজের আকার বড় এবং রং উজ্জ্বল সবুজ	বীজের আকার মাঝারি এবং রং উজ্জ্বল সবুজ
হেক্টর প্রতি গড় ফলন	১১০০ কেজি	১৫০০ কেজি	১৫০০ কেজি
রোগবালাই	হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সার্কোস্পোরা রোগ প্রতিরোধ সক্ষম	হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সার্কোস্পোরা রোগ প্রতিরোধ সক্ষম	হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সার্কোস্পোরা রোগ প্রতিরোধ সক্ষম

সারণী-৩: গ্রীষ্মকালীন জাতগুলোর (বিনামুগ-৭, বিনামুগ-৮, বিনামুগ-৯, বিনামুগ-১০) তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	বিনামুগ-৭	বিনামুগ-৮	বিনামুগ-৯	বিনামুগ-১০
পরিপক্ক	প্রায় ৮০% ফল একই সঙ্গে পাকে	প্রায় ৮০% ফল একই সঙ্গে পাকে	প্রায় ৮০% ফল একই সঙ্গে পাকে	প্রায় ৮৫-৯০% ফল একই সঙ্গে পাকে
জীবনকাল	৭৪-৭৮ দিন	৬৪-৬৭ দিন	৬০-৬৪ দিন	৬২-৬৪ দিন
বীজের আকার ও রঙ	বীজ গাঢ় সবুজ বর্ণের	বীজের আকার মাঝারি ও উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের	বীজের আকার মাঝারি ও উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের	বীজের আকার বড় ও উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের
হেক্টর প্রতি গড় ফলন	১৮০০ কেজি	১৮০০ কেজি	১৮০০ কেজি	১৮০০ কেজি
রোগবালাই	হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন এবং সার্কোস্পোরা রোগ প্রতিরোধ সক্ষম	হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন	হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন	হলুদ মোজাইক ভাইরাস এবং সার্কোস্পোরা রোগ সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন

মুগের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ জমিতে চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। বৃষ্টি বা অন্য কারণে ক্ষেতে পানি জমে গেলে দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জমি তৈরি

তিন-চারটি চাষ ও মই দিয়ে সাধারণভাবে জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হয়। ২টি চাষ দেয়ার পর নির্ধারিত পরিমাণ ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমওপি সার ছিটিয়ে পুনরায় চাষ এবং মই দিতে হবে। জমিতে রসের অভাব হলে একটি হালকা সেচ দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বীজ অংকুরোদগমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

বপনের সময়

মুগকলাই শীত ও গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়। এই দুই মৌসুমের বপনের সময় নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

শীতকালীন জাত

ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বীজ বপন সম্পন্ন করতে হবে। বিলম্বে বীজ বপন করলে ফলন হ্রাস পায়।

গ্রীষ্মকালীন জাত

গ্রীষ্মকালীন মুগ বপনের সময় অঞ্চলভেদে কিছুটা তারতম্য হয়। বরিশাল বিভাগের জেলাসমূহে মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ (জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চের দ্বিতীয়) সপ্তাহ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বীজ বপন সম্পন্ন করতে হবে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে মধ্য ফাল্গুন থেকে শেষ (মার্চ এর প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বীজ বপন সম্পন্ন করতে হবে। বিলম্বে বপন করলে ফলন হ্রাস পায়। আষাঢ় মাসের (মধ্য জুন থেকে মধ্য জুলাই) অবিরাম বৃষ্টিতে মুগের ফল পচে যায়। এ মুগের জীবনকাল তিন মাস বিধায় চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে (মধ্য মার্চ) বীজ বপন সম্পন্ন করতে পারলে আষাঢ় মাসের বৃষ্টির পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা যায় এবং ফল পচনের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়। অপরদিকে অনুমোদিত সময়ের পূর্বে বীজ বপন করলে শীতের কারণে চারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সারের পরিমান

মুগের জাত অনুসারে সারের প্রয়োগ মাত্রাঃ

জাতের নাম	একক	সারের পরিমাণ (কেজি)					
		ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা	মলিবডেনাম
বিনামুগ-১ বিনামুগ-৩ বিনামুগ-৪	হেক্টর প্রতি	২০-৩০	৮০-১০০	৪০-৫০	৫০-৭০	২.৪-৪.০	০.৫-২.০
	একর প্রতি	৮-১২	৩২-৪০	১৬-২০	২০-২৮	০.৮-১.৬	০.২-০.৮
বিনামুগ-২ বিনামুগ-৫ বিনামুগ-৬ বিনামুগ-৭	হেক্টর প্রতি	৩০-৪০	৮০-১২০	৫০-৭০	৫০-৭০	৩.০-৫.০	০.৫-২.০
	একর প্রতি	১২-১৬	৩২-৪৮	২০-২৮	২০-২৮	১.২-২.০	০.২-০.৮
বিনামুগ-৮ বিনামুগ-৯ বিনামুগ-১০	হেক্টর প্রতি	৩০-৪০	৭০-৯০	৩৫-৪৫	৫০-৭০	২.৪-৪.০	০.৫-২.০
	একর প্রতি	১২-১৪	২৮-৩০	১৪-১৬	২০-২৮	১.৪-২.০	০.২-০.৮
জীবাণুসার (ইউরিয়ার পরিবর্তে)		একর প্রতি ০.৬ কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে					

জমির উর্বরতার ওপর নির্ভর করে সারের মাত্রার তারতম্য করা যেতে পারে। মুগ চাষাবাদে দেখা যায় যে বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক ক্ষেত্রে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জমি চাষ ছাড়া শুধু ছিটিয়ে বীজ বপন করলে বীজ নষ্ট কম হয় এবং ঝুঁকি কম থাকে। সুতরাং জমির উর্বরতা, জমিতে আবাদকৃত পূর্বের ফসল এবং বৃষ্টিপাতের অবস্থা ও মৌসুম বিবেচনা করে জমি চাষ দেয়া বা না দেয়া এবং সার প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আগাম রবি মৌসুমে কাদাযুক্ত জমিতে চাষ ছাড়াই বপন করা যেতে পারে। তবে শুষ্ক এবং উঁচু জমিতে চাষ দিয়ে বপন করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন উচ্চ ফলনশীল জাতগুলো সাধারণত চাষ দিয়েই বুনতে হবে, না হলে ফলন ভাল হবে না।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ন সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে জীবানু সার ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত জীবানু সার ব্যবহার করলে ইউরিয়া প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

বপন পদ্ধতি

মুগকলাই প্রধানত ছিটিয়ে বপন করা হয়। বপনের পর ভালভাবে মই দিয়ে বীজগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-১০ সে.মি. হতে হবে। সারিতে বপন করলে ফসল পরিচর্যায় সুবিধা হয়। তবে বিনামুগ-৪ এর ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ সে.মি.। নিচু জমি থেকে বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর কর্দমাক্ত জমিতে চাষ ছাড়াই বীজ বোনা হলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। উঁচু জমিতে চাষ করা জমিতে মুগডাল বপন করলেও বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে পানি জমে গেলে দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় বীজ/চারা পচে যাবে।

বীজের হার

নিম্নে বিভিন্ন জাতের বীজের মাত্রা দেয়া হলো

জাতের নাম	*হেক্টর প্রতি (কেজি)*	*একর প্রতি (কেজি)*
বিনামুগ-১	*২০-২৫*	*৮-১০*
বিনামুগ-২	*২০-২৫*	*৮-১০*
বিনামুগ-৩	*২০-২৫*	*৮-১০*
বিনামুগ-৪	*২৫-৩০*	*১০-১২*
বিনামুগ-৫	*২০-২৫*	*৮-১০*
বিনামুগ-৬	*২০-২৫*	*৮-১০*
বিনামুগ-৭	*২০-২৫*	*৮-১০*
বিনামুগ-৮	*২৫-৩০*	*১০-১২*
বিনামুগ-৯	*২৫-৩০*	*১০-১২*
বিনামুগ-১০	*২৫-৩০*	*১০-১২*

লাইনে বপন করলে বীজের পরিমাণ কিছু কম দিতে হবে।

বীজ শোধন

বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজ ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০/প্রোভ্যাক্স/ব্যাভিষ্টিন ৫০ ডব্লিউপি দ্বারা শোধন করে বপন করা যেতে পারে।

আগাছা দমন

চারা গজানোর পরে জমিতে আগাছা দেখা গেলে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে হালকাভাবে আগাছাগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। এতে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সেচ প্রয়োগ

মুগকলাই চাষাবাদের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে জমিতে অত্যধিক রসের অভাব হলে একবার সেচ দেয়া বাঞ্চনীয়। এতে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

সাধারণত ছত্রাকনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। তবে ছত্রাকের মারাত্মক আক্রমণ হলে ডাইথেন এম-৪৫ (প্রতি লিটারে ২ গ্রাম) বা অন্য কোন ছত্রাকনাশক ফসলি জমিতে স্প্রে আকারে প্রয়োগ করলে রোগ দমন করা যেতে পারে। পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে ডায়াজিনন বা ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি ইত্যাদি কীটনাশক মাত্রা অনুযায়ী স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

ক্ষেত থেকে মুগকলাই সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক। কারণ দেশে যে সকল জাত আছে সেগুলোর ফল এক সাথে পাকে না বিধায় কয়েকবার সংগ্রহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বিনা উদ্ভাবিত মুগের জাতগুলির ৮০% ফল প্রায় একসঙ্গে পাকে এবং একসাথে সংগ্রহ করা সম্ভব। এছাড়া ফসল জমি থেকে কেটে নিলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এরপর ফলগুলো ভালভাবে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত বীজ ৪-৫ দিন টানা রোদে শুকিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে মোটা পলিথিন ব্যাগ, মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করা হলে অনেকদিন পর্যন্ত বীজ ভাল থাকে। সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতা কমিয়ে ৮-৯% এ আনতে হবে। সংরক্ষিত বীজ অনার্দ্র পরিবেশে ঠান্ডা উঁচু স্থানে রাখতে হবে। সংরক্ষণ পাত্রের চারপাশ সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণ না হয়। সংরক্ষিত বীজ বাতাসের সংস্পর্শে এলে বীজে পোকামাকড়ের আক্রমণ ঘটে, ফলে বীজ নষ্ট হয়ে যায়।

ছোলা

বাংলাদেশে ছোলা (*Cicer arietinum* L.) একটি জনপ্রিয় ডাল ফসল। ছোলাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশক্তি ও প্রোটিন আছে। দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, মাগুরা, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী ইত্যাদি এলাকায় আমন ধান কাটার পর ব্যাপকভাবে ছোলার চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া সাথি ফসল হিসেবেও এর ব্যাপক চাষ হয়ে আসছে। সময় মত বপন, উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার ও চাষাবাদের আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করতে পারলে ডালের ঘাটতি পূরণে ছোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিনা থেকে এ পর্যন্ত ১০টি ছোলার উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

হাইপ্রোছোলা

গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশি ছোলার জাত 'ফরিদপুর-১' এর বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে এ জাতের উদ্ভাবন করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে এ জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সারাদেশে কৃষক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

হাইপ্রোছোলা মাতৃজাত ফরিদপুর-১ থেকে শতকরা ২০ ভাগ বেশী ফলন দেয়। একর প্রতি ফলন হাইপ্রোছোলা ১৫০০ কেজি ও ফরিদপুর-৬০০ কেজি। এ জাতে ২২.৫% প্রোটিন ও ফরিদপুর-১ এ ১৮.৫% প্রোটিন আছে। এ জাত মাতৃজাত ফরিদপুর-১ থেকে এক সপ্তাহ আগে পাকে। হাইপ্রোছোলার গাছ মাতৃজাত ফরিদপুর-১ থেকে ১০ সে.মি. ছোট হয়।

মাঠে হাইপ্রোছোলা

হাইপ্রোছোলার বীজ

বিনাছোলা-২

দেশি ও বিদেশি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গবেষণাগারে ও মাঠ পর্যায়ে জি-৯৭ একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড এ জাতটি বিনাছোলা-২ নামে সারাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

উপযুক্ত পরিবেশে বিনাছোলা-২ এর বীজের ফলন হেক্টর প্রতি ১৬০০ কেজি ও একর প্রতি প্রায় ৬৫০ কেজি। বীজ বপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত এলাকাভেদে ১২০-১৩৫ দিন সময় লাগে। বীজের আকার বড়। গাছের উচ্চতা ৫০-৭০ সে.মি.। বিনাছোলা-২ এর কান্ড শক্ত, ও খাড়া। বীজে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৩.৪ ভাগ।

মাঠে বিনাছোলা-২

বিনাছোলা-২ এর বীজ

বিনাছোলা-৩

বিদেশী জার্মপ্লাজম জি-৯৭ (বিনাছোলা-২) এর বীজে ২০০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পরবর্তী বছরগুলোতে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি মিউট্যান্ট, এল-৮৪

নির্বাচন করা হয়। মিউট্যান্টটি ২০০১ সালে বিনাছোলা-৩ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে রবি মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হয়।

বিনাছোলা-৩ এর হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৫৮ টন। জীবনকাল ১১৫-১২০ দিন। বীজে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২১.৩ ভাগ। বীজের আকার মাঝারি।

মাঠে বিনাছোলা-৩

বিনাছোলা-৩ এর বীজ

বিনাছোলা-৪

হাইপ্রোছোলার সাথে ICRISAT এর কে-৮৫০ নামক প্রজনন সারির সংকরায়ণ করা হয়। সংকরায়িত বীজ থেকে পরবর্তীতে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে পি-৩৪ নামে একটি লাইন নির্বাচন করা হয়। লাইনটি ২০০১ সালে বিনাছোলা-৪ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

বিনাছোলা-৪ এর হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৬৩ টন। জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন। বীজে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২২.৪ ভাগ। বীজের আকার মাঝারি।

মাঠে বিনাছোলা-৪

বিনাছোলা-৪ এর বীজ

বিনাছোলা-৫

বিনা উদ্ভাবিত হাইপ্রোছোলার বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে প্রাপ্ত লাইনটি আঞ্চলিক ও কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় ২০০৯ সালে বিনাছোলা-৫ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে রবি মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

বিনাছোলা-৫ এর হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৫২ টন। বীজে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৩.৫০ ভাগ। বীজের আকার মাঝারি। বীজের রঙ সবুজ। জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন।

মাঠে বিনাছোলা-৫

বিনাছোলা-৫ এর বীজ

বিনাছোলা-৬

বিনা উদ্ভাবিত মিউট্যান্ট জি-২৯৯ এর সাথে ইক্রিস্যাট (ICRISAT) হতে কে-৮৫০ নামে একটি জাতের সংকরায়ণ করে প্রাপ্ত লাইনটি আঞ্চলিক ও কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয় এবং ২০০৯ সালে বিনাছোলা-৬ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে রবি মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

বিনাছোলা-৬ ফলন হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৬৯ টন। বীজে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৩.১০ ভাগ। বীজের আকার মাঝারী। ১০০টি বীজের ওজন ১৪.৩ গ্রাম। জীবনকাল ১২২-১২৬ দিন।

মাঠে বিনাছোলা-৬

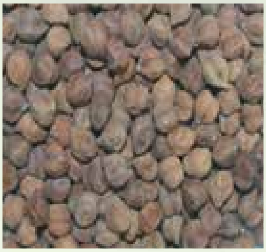

বিনাছোলা-৬ এর বীজ

বিনাছোলা-৭

বিনাছোলা-২ এর বীজে ২০০ গ্রে মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি লাইন সিপিএম-৮৬০ নির্বাচন করা হয়। দেশে প্রচলিত অন্যান্য জাত ও মিউট্যান্ট এর সাথে সিপিএম-৮৬০ লাইনটি আঞ্চলিক ও কৃষকের মাঠে ফলন এবং অন্যান্য গুণাবলী পরীক্ষা করে আশানুরুপ ফলাফল পাওয়ায় ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে রবি মৌসুমে চাষাবাদের জন্য উক্ত সিপিএম-৮৬০ লাইনটি বিনাছোলা-৭ নামে নিবন্ধন করা হয়।

মাঠে বিনাছোলা-৭

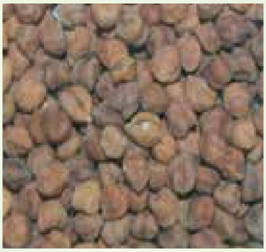

বিনাছোলা-৭ এর বীজ

বিনাছোলা-৭ এর ফলন হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৭ টন। বীজে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৩.৫০ ভাগ। বীজের আকার মাঝারি। জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন।

বিনাছোলা-৮

বিনা হাইপ্রোছোলা জাতের বীজের সাথে ICRISAT হতে প্রাপ্ত কে-৮৫০ নামক একটি জাতের সংকরায়ণ করে প্রাপ্ত পি-৭০ লাইনটি চেকজাত ও অন্যান্য মিউট্যান্ট এর সাথে আঞ্চলিক ও কৃষকের মাঠে ফলন ও অন্যান্য গুণাবলী পরীক্ষা করে সর্বোচ্চ ফলন এবং ভাল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করায় ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে রবি মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিনাছোলা-৮ নামে নিবন্ধন করা হয়।

বিনাছোলা-৮ এর ফলন হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৮ টন। বীজে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৩.৮০ ভাগ। বীজের আকার মাঝারি। জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন।

মাঠে বিনাছোলা-৮

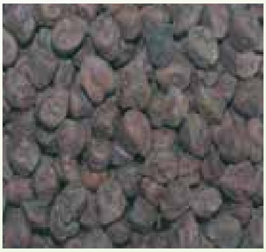

বিনাছোলা-৮ এর বীজ

বিনাছোলা-৯

বিনা উদ্ভাবিত ছোলার উন্নত জাত বিনাছোলা-২ এর বীজে ৩০০ গ্রে মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি লাইন সিপিএম-কাবুলি নির্বাচন করা হয়। লাইনটি ২০১৬ সালে বিনাছোলা-৯ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে রবি মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

বিনাছোলা-৯ এর হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৭০ টন। বীজের আকার বড়। জীবনকাল ১১৫-১২৫ দিন।

মাঠে বিনাছোলা-৯

বিনাছোলা-৯ এর বীজ

বিনাছোলা-১০

বিনা উদ্ভাবিত ছোলার অগ্রবর্তী মিউট্যান্ট সিপিএম-৮৬০ এর বীজে ২০০ গ্রে মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করার ফলে প্রাপ্ত লাইনটি ভাল ফলন দেয়। লাইনটি ২০১৬ সালে বিনাছোলা-১০ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে রবি মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়।

মাঠে বিনাছোলা-১০

বিনাছোলা-১০ এর বীজ

বিনাছোলা-১০ এর হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৮১ টন। বীজের আকার বড়। জীবনকাল ১১৫-১২২ দিন।

ছোলার উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

ছোলা চাষে বেলে দো-আঁশ হতে এঁটেল দো-আঁশ মাটি বেশি উপযোগী। তবে অন্য মাটিতেও চাষ করা যেতে পারে।

জমি তৈরি

তিন-চারটি চাষ ও মই দিয়ে সাধারণভাবে জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হয়। দু'টি চাষ দেয়ার পর নির্ধারিত পরিমাণ সার দিয়ে পুনরায় চাষ ও মই দিতে হবে। জমিতে রসের অভাব হলে হালকা সেচ দেয়া প্রয়োজন, অন্যথায় বীজ থেকে চারা গজানো বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

বীজের বপনের সময়

১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর (কার্তিক মাস) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার

ছোলা চাষের জন্য হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ কেজি (একর প্রতি ১৮-২০ কেজি) বীজের প্রয়োজন হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ছোলা আবাদের জন্য সাধারণত খুব বেশি সার প্রয়োগের দরকার হয় না। তবে জমির প্রকারভেদে নিম্নোক্ত পরিমাণ সার জমিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারের নাম	হেক্টর প্রতি (কেজি)	একর প্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	২৫-৩৫	১০-১৪
টিএসপি	৮০-১২০	৩২-৪৮
এমপি	৫০-৭০	২০-২৮
জিপসাম	৫০-৯০	২০-৩৬
দস্তা	২.০-৪.০	০.৮-১.৬
বোরন	১.৫-৪.০	০.৬-১.৬০
মলিবডেনাম	০.৫-২.০	০.২-০.৮
জীবাণুসার (ইউরিয়ার পরিবর্তে)	১.৫	০.৬

বীজের পরিমাণ

হাইপ্রোছোলার বীজ লাইনে বপন করতে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি, একর প্রতি ১৬ কেজি, বিঘা প্রতি ৬ কেজি প্রয়োজন হয়। ছিটিয়ে বপন করলে একরে ৩ কেজি বীজ বেশি লাগবে। অন্য পাঁচটি জাতের বীজ আকারে বড়, তাই হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ কেজি বীজ লাগবে।

বপনের পদ্ধতি

বীজ ছিটিয়ে বা লাইনে বপন করা যায়। লাইনে বুনতে হলে লাইন হতে লাইনের দূরত্ব ১ ফুট ও বীজ হতে বীজের দূরত্ব ৪-৬ ইঞ্চি হতে হবে। বীজ জমিতে ছিটানোর পর হালকা চাষ ও মই দিতে হবে। লাইনে বুনলে মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

আগাছা দমন

চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর নিড়ানী দিয়ে সতর্কতার সাথে হালকাভাবে আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে। শিকড়ে যেন কোন প্রকার আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পানি সেচ

ছোলা চাষে স্বাভাবিক অবস্থায় সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে ফসলের শেষ দিকে মাটিতে রসের অত্যধিক অভাব হলে একবার হালকা সেচ দেয়া যেতে পারে।

পরিচর্যা

আগাছা দেখা দিলে একবার নিড়ানি দিতে হবে। গাছের শিকড়ের নিকট মাটি নাড়াচাড়া না করাই ভাল। গাছের বৃদ্ধি খুব বেশি দেখলে প্রয়োজনমত গাছ তুলে পাতলা করে দিতে হবে। অতিরিক্ত পানি দাঁড়ায় না এমন জমিতে ছোলার চাষ করা উচিত।

পোকা ও রোগবালাই দমন

বট্রাইটিস গ্রে-মোল্ড

বট্রাইটিস প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ ঘটে থাকে। ছোলার বৃদ্ধি অবস্থায় কিংবা ফল আসার শুরুতেই এ রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। জমিতে গাছ বেশি ঘন থাকলে এবং বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকলে এ রোগ ব্যাপকতা লাভ করে। এ রোগের লক্ষণ কান্ড, পাতা, ফুল ও ফলে প্রকাশ পায়। আক্রান্ত স্থানে ধূসর রঙের ছত্রাকের উপস্থিতি দেখা যায়।

প্রতিকার

- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ব্যাভিস্টিন ০.২% হারে ১০-১২ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- ব্যাভিস্টিন অথবা থিরাম প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।
- বোরার নামক পোকার আক্রমণ হলে ১ মিলি রিপকর্ড ১০ ইসি ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে দু'বার ছিটিয়ে দিতে হবে।
- একই জমিতে বারবার ছোলা চাষ করা ঠিক নয়। তাতে গোড়া পঁচা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

উইল্ট

ফিউজেরিয়াম অক্সিসপোরাম নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। চারা অবস্থায় এ রোগে আক্রান্ত গাছ মারা যায়।

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করতে হবে।
- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে।

গোড়া পচা

স্কেলেরোসিয়াম রলফসি নামক ছত্রাক দ্বারা রোগ হয়। চারা গাছে এ রোগ বেশি দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ হলদে হয়ে যায় এবং শিকড় ও কান্ডের সংযোগস্থলে কালো দাগ পড়ে। গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে। আক্রান্ত স্থানে গাছের গোড়ায় ছত্রাকের জালিকা ও সরিষার দানার মত স্কেলেরোসিয়া গুটি দেখা যায়।

প্রতিকার

- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- সুষম হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ভিটাভেক্স-২০০ প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

ফল পেকে গেলে তাড়াতাড়ি ফসল কেটে ফেলা উচিত। কাঁচি দিয়ে গোড়া থেকে গাছ কেটে নিতে হবে। এতে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাছগুলো ভালভাবে শুকিয়ে, শুকনো পরিষ্কার স্থানে রেখে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। শস্য মাড়াইয়ের পর ভালভাবে পরিষ্কার করে ও রোদে কয়েকদিন শুকাবার পর শুকানো বীজ কেরোসিন বা বিস্কুটের টিন, আলকাতরার প্রলেপ (বাইরে) দেয়া মাটির কলসি বা জালা, ড্রাম অথবা মোটা পলিথিনের ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের আগে রৌদ্রে শুকানো বীজ অবশ্যই ঠান্ডা করে নিতে হবে।

মাষকলাই

বাংলাদেশে প্রচলিত ডাল ফসলের মধ্যে মাসকলাইয়ের স্থান চতুর্থ। দেশের মোট উৎপাদিত ডালের ৯-১১% আসে মাসকলাই থেকে। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় চাষ বেশি হয়ে থাকে। দেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য এটি একটি জনপ্রিয় ডাল।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক মাষকলাইয়ের একটি জাত 'বিনামাষ-১' উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বিনামাষ-১

রাজশাহীর স্থানীয় জাতের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে ও মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯৪ সালে কৃষক পর্যায়ে আবাদের জন্য এ জাতটি অনুমোদন লাভ করে।

মাঠে বিনামাষ-১

বিনামাষ-১ এর বীজ

বিনামাষ-১ এর কান্ড খাড়া এবং গাছের উচ্চতা ২০-২৫ সে.মি। মাতৃজাত বি-১০ হতে ফলন ৩১% বেশি। বীজের রঙ কাল এবং সমস্ত ফল একই সাথে পাকে। ইহা হলুদ মোজাইক ও পাতা পঁচা রোগ সহ্য করতে পারে। বিনামাষ-১ এর হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১ টন। জীবনকাল ৮০-৮৫ দিন।

মাষকলাই এর উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

সকল প্রকার জমিতে বিনামাষ-১ বপন করা যায়। তবে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এরকম জমি নির্বাচন করা উত্তম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

বিনামাষ-১ চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য মাষকলাইয়ের চাষাবাদ পদ্ধতির অনুরুপ। এ জাতের চাষাবাদ সম্পর্কে কিছু তথ্য নিম্নে দেয়া হলো।

বপনের সময়

এলাকাভেদে ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপন করা চলে। বিলম্বে বীজ বপন করলে ফলন হ্রাস পায়।

জমি তৈরি

দু-তিনটি চাষ ও মই দিয়ে সাধারণভাবে বীজ বপন করতে হয়।

সার প্রয়োগ

যে জমিতে পূর্ববর্তী ফসল ধান বা পাট চাষ করা হয়েছিল এবং সার প্রয়োগ করা হয়েছিল উক্ত জমিতে বিনামাষ-১ এর চাষাবাদে সাধারণত: কোন সার প্রয়োগের দরকার হয় না। তবে অনুর্বর জমিতে নিম্নরুপ সার ব্যবহার করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	
	হেক্টর প্রতি	*একর প্রতি*
ইউরিয়া	১৫	৬
টিএসপি	৪০	১৬
এমওপি	২০	৮

বপন পদ্ধতি

বীজ ছিটিয়ে বা লাইনে বোনা যায়। নিচু এলাকায় বন্যার পানি নেমে গেলে নরম মাটির উপর ছিটিয়ে বোনা যেতে পারে।

বীজের পরিমাণ

প্রতি হেক্টরে ২০ থেকে ২৫ কেজি এবং একর প্রতি ৮-১০ কেজি বীজ প্রয়োজন।

আগাছা দমন

চারা গজানোর পরে জমিতে আগাছা দেখা দিলে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানী দিয়ে হালকাভাবে আগাছাগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। এতে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

পানি সেচ

সাধারণত: সেচের প্রয়োজন হয় না।

রোগ ও পোকা-মাকড় দমন

বিনামাষ-১ এর জাতটি হলুদ মোজাইক রোগ ও পাতা পঁচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। সাধারণত: কোন ছত্রাকনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। তবে ছত্রাকের আক্রমন মারাত্মক হলে ডায়থেন এম-৪৫ বা অন্য কোন ছত্রাকনাশক স্প্রে আকারে প্রয়োগ করা উচিত। পোকা মাকড়ের আক্রমণ হলে সবিক্রন-৪২৫ ইসি বা ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি, সিমবুশ ইত্যাদি কীটনাশক মাত্রা অনুযায়ী স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

বিনামাষ-১ এর ফলগুলি একই সাথে পাকে। ফলে বীজ সংগ্রহ সুবিধাজনক। ফল পেকে গেলে কাঁচি দিয়ে গাছগুলো গোড়া থেকে কেটে নিতে হবে। এতে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাছগুলো ভালভাবে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গর দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত বীজ রোদে ভালভাবে শুকিয়ে পরিষ্কার করে মাটি বা টিনের পাত্রে অথবা মোটা পলিথিন দিয়ে বস্তায় ভালভাবে মুখ বন্ধ করে রাখলে অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

খেসারি

খেসারি এর ইংরেজি নাম Grasspea এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Lathyrus sativus* L. ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপালসহ দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এ ডালের ব্যবহার বহুদিনের পুরনো। খেসারি ডাল-এ শতকরা প্রায় ২০-২৩ ভাগ আমিষ থাকে।

বিনাখেসারি-১

একটি স্থানীয় জাত (BINA ACC. L-1) এর বীজে ২৫০ গ্রে মাত্রার গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উন্নত একটি লাইন নির্বাচন করা হয়। লাইনটি ২০০১ সালে বিনাখেসারি-১ নামে রবি মৌসুমে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়।

এটি উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছের পাতার রঙ গাঢ় সবুজ, জীবনকাল ১১৫-১২৫ দিন, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৯ টন। অন্যান্য স্থানীয় জাত অপেক্ষা ৬-১০% বেশি। বীজের আবরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো দাগ আছে, ফলে এ জাত সনাক্তকরণ সহজ। স্থানীয় জাত ও অন্যান্য জাতের মতই জাতটি রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। বীজে নিউরোটক্সিন বিষ BOAA এর পরিমাণ ০.২৩%। রান্না করার পূর্বে ৬-৮ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে উঠানোর পর রান্না করলে এর বিষাক্ততা থাকে না।

মাঠে বিনাখেসারী-১

খেসারির উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

বেলে দো-আঁশ এবং দো-আঁশ মাটির জমিতে বপনে অধিক ফলন পাওয়া।

জমি তৈরি

তিন থেকে চারটি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হয়।

বপনের সময়

কার্তিক মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ন মাসের শেষ (নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বীজ বপন সম্পন্ন করতে হবে। বিলম্বে বপন করলে ফলন হ্রাস পায়।

বীজ হার

ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি (একর প্রতি ১৬ কেজি) এবং সারিতে বপন করলে প্রতি হেক্টরে ৩৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বপন পদ্ধতি

সাধারণত চাষ করা জমিতে বীজ ছিটিয়ে বোনার পর মই দিয়ে বীজগুলো ঢেকে দিতে হবে। এছাড়া ধান ক্ষেতে বিনা চাষে খেসারি বপন করা যায়, তবে জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকা প্রয়োজন।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	
	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি
ইউরিয়া	৩৫	১৪
টিএসপি	৬৫	২৬
এমওপি	৪৫	১৮

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

দুইটি চাষ দেয়ার পর ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমওপি সার ছিটিয়ে পুনরায় চাষ ও মই দিতে হয়।

পানি সেচ

বীজ বপনের সময় জমিতে পানির অভাব থাকলে একটি হাল্কা সেচ দেয়া যেতে পারে।

রোগ ও পোকা-মাকড় দমন

খেসারি ফসলে সাধারণত রোগবালাই এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। তবে পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে সবিক্রণ-৪২৫ ইসি বা ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় বিকাল বেলা স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

শতকরা ৮০ ভাগ ফল যখন খড়ের রঙ ধারণ করে তখন গাছসহ তা জমি থেকে উঠিয়ে নিতে হয়। কর্তনের পর ফলসহ গাছ ৩-৪ দিন রোদে শুকানোর পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। তারপর সংগৃহীত বীজগুলো ভালভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করে আরো ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা বীজ মাটি বা টিনের পাত্রে রেখে মুখ বন্ধ করে অপেক্ষাকৃত শীতল ও কম আর্দ্র পরিবেশে সংরক্ষণ করতে হবে।

সবজি ফসল

টমেটো

বিশ্বের ছোট বড় সব মানুষের পছন্দের খাবার টমেটো। এটি সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় উঁচুমানের পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি সবজি। এতে আছে বিটা কেরোটিন যা রাতকানা রোগের মহৌষধ। ভিটামিন-সি'র জন্য টমেটো জগদ্বিখ্যাত। এতে আরও আছে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, শর্করা, খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। টমেটো ভেষজ গুণেও সমৃদ্ধ। এর রস ও শাঁস সহজপাচ্য। কাঁচা টমেটোতে পাকা টমেটোর চেয়ে আমিষ, ভিটামিন-সি, খনিজ লবণ, লৌহ ও খাদ্যশক্তি বেশি থাকে। একটি বড় আকারের লাল টমেটো থেকে আমাদের দৈনিক চাহিদার প্রায় অর্ধেক ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার পাশাপাশি ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার রোধে টমেটোর কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। লাইকোপেন নামক এক প্রকার এন্টিঅক্সিডেন্ট দেহকোষ থেকে বিষাক্ত ফ্রি রেডিকেল দূর করে প্রোস্টেট ক্যান্সারসহ মূত্রথলি, অগ্নাশয় ও অন্ননালির ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। দৈনিক একটি করে টমেটো খেলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৬০ ভাগ হ্রাস পায়। একটি গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যে সব মহিলার কোষে লাইকোপেন ও অন্যান্য ক্যারটিনয়েডের পরিমাণ বেশি তাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কম। যারা নিয়মিত টমেটো খান তাদের পাকস্থলি, অন্ত্র ও মলদ্বারে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। টমেটো নানাভাবে খাওয়া যেতে পারে। কাঁচা কিংবা রান্না ছাড়াও টমেটো থেকে সালাদ, জ্যাম, জেলি, চাটনি, কেচ-আপ বা সস তৈরি করে খাওয়া যায়। আমাদের দেশে টমেটো চাষাবাদ ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বিনা থেকে এ পর্যন্ত টমেটোর ১৩ টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতগুলো জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের পর বর্তমানে কৃষকের জমিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে। জাতগুলো উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য এবং চাষাবাদ পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হলো।

বাহার

দেশী একটি টমেটো জাতের বীজে গামারশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে "আণবিক" নামে একটি মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। মিউট্যান্টটিতে গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫টি কিন্তু ফলের আকার বেশ ছোট এবং খেতে বেশ টক ছিল। এ মিউট্যান্টটির ফলের মান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অক্সহার্ট নামের প্রচলিত জাতের সংগে সংকরায়ণ করা হয়। একটি সংকর লাইন ভাল গুণের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত এ লাইনটি ১৯৯২ সালে বাহার নামে নতুন টমেটো জাত হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বাহার

এ জাতের গাছের উচ্চতা ৮০-৮৫ সে.মি. পাতার রং সবুজ, ফলের আকৃতি গোলাকার ও বড়, প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা

১৬-২০ টি, প্রতি ফলের ওজন ১১০ গ্রাম, চারা লাগানো হতে ফল পাকা পর্যন্ত সময় লাগে ৯০-৯৫ দিন, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬৬ টন।

বিনাটমেটো-২ ও বিনাটমেটো-৩ (গ্রীষ্মকালীন জাত)

একটি স্থানীয় জাতে গামারশ্মি প্রয়োগ করে এস-১ নামক একটি গ্রীষ্মকালীন মিউট্যান্ট পাওয়া যায়। মিউট্যান্টটির ফল আকারে বেশ ছোট, খেতে টক এবং ফলন কম থাকায় শীতকালীন টমেটো বাহার এর সংগে সংকরায়ণ করে দু'টি গ্রীষ্মকালীন উচ্চ ফলনশীল লাইন উদ্ভাবন করা হয়। এ লাইন দু'টি ১৯৯৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনাটমেটো-২ ও বিনাটমেটো-৩ নামে নিবন্ধিত হয়। জাত দু'টিতে ফল ধরার জন্য কোন রকম হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

বিনাটমেটো-২ এর গাছের উচ্চতা ৭৫-৮০ সে.মি., পাতা হালকা সবুজ এবং কিছুটা কোঁকড়ানো। ফলের আকার গোল ও উপরের দিকে সামান্য শির আছে। প্রতিটি গাছে ফলের সংখ্যা ১৮-২২ টি এবং প্রতি ফলের গড় ওজন ৫০ গ্রাম। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৩৬-৪০ টন। ভিটামিন সি এর পরিমান ১৮.০ মি.গ্রা./১০০ গ্রা ফ্রেশ ওজন।

বিনাটমেটো-৩ এর গাছের উচ্চতা ৮০-৮৫ সে.মি., পাতা হালকা সবুজ এবং কিছুটা কোঁকড়ানো। ফলের আকার কিছুটা চ্যাপ্টা ও স্পষ্ট শিরযুক্ত। প্রতিটি গাছে ফলের সংখ্যা ১২-১৪ টি এবং প্রতি ফলের গড় ওজন ৮২ গ্রাম। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৩৮-৪২ টন। ভিটামিন সি এর পরিমান ১৯.৫ মিগ্রা/১০০ গ্রা. ফ্রেশ ওজন।

বিনাটমেটো-২

বিনাটমেটো-৩

বিনাটমেটো-৪ এবং বিনাটমেটো-৫

ফিলিপাইন ও তাইওয়ান থেকে সংগৃহীত দু'টি টমেটো জাতের বীজে গামারশ্মি প্রয়োগ করে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি বিশিষ্ট নতুন দু'টি মিউট্যান্ট লাইন, ৩০০ গ্রে গামারশ্মি থেকে প্রাপ্ত টিএম-১৩০ এবং ২৫০ গ্রে রশ্মি থেকে প্রাপ্ত টিএম-১৩৫ সনাক্ত করা হয়। তারপর গবেষণাগার এবং বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে কৃষকের মাঠে ৬-৭ বছর যাবৎ ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়। এ মিউট্যান্ট দু'টিকে যথাক্রমে বিনাটমেটো-৪ ও বিনাটমেটো-৫ নামে ২০০৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক শীতকালে দেশব্যাপী চাষাবাদের জন্য ছাড় করা হয়েছে।

বিনাটমেটো-৪ এর গাছের উচ্চতা ৭০-৭৫ সে.মি., ফলের আকৃতি গোলাকার ও মসৃণ। প্রতিটি গাছে ২২-২৮ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৮২ গ্রাম। চারা লাগানোর ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং মাসাধিকাল পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৮২ টন ফলন পাওয়া যায়।

বিনাটমেটো-৪

বিনাটমেটো-৫

বিনাটমেটো-৫ এর গাছের উচ্চতা ৯২-৯৮ সে.মি., ফল কিছুটা লম্বাটে এবং মসৃণ। প্রতিটি গাছে ৩০-৩৫ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের ওজন ৫৫ গ্রাম। চারা লাগানো হতে ফল পাওয়া পর্যন্ত সময় লাগে ৯০-৯৫ দিন। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬৯ টন।

বিনাটমেটো-৬ এবং বিনাটমেটো-৭

উচ্চ ফলনশীল বিনাটমেটো-৬ এবং বিনাটমেটো-৭ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১০ ও ২০১১ সালে স্থানীয় আবহাওয়া উপযোগী হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বিনাটমেটো-৬ এর গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সে.মি., প্রতিটি গাছে ফলের ছড়ার সংখ্যা ১০-১২ টি এবং প্রতিটি গাছে ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫ টি। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৫৫ গ্রাম এবং হেক্টর প্রতি ফলন শীতকালে ৮৫ টন, গ্রীষ্মকালে ৪০ টন। পরিপক্ক অবস্থায় ফলের রং লাল এবং গোলাকার বোঁটার বিপরীত দিকে সামান্য সূঁচালো। ভিটামিন সি (পরিপক্ক ফলে) ১৯.৪০ মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম ফ্রেশ ওজন। ফল ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। ফল মাংসল ও সুস্বাদু। জীবনকাল ১২০-১২৪ দিন এবং বিনাটমেটো-৬ সারা বছর চাষ করা যায়।

বিনাটমেটো-৬

বিনাটমেটো-৭

বিনাটমেটো-৭ এর গাছের উচ্চতা ৮০-৮৫ সে.মি। প্রতিটি গাছে ফলের ছড়া সংখ্যা ১০-১৩ টি, ফলের সংখ্যা ২৫-৩০ টি, প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৬০ গ্রাম এবং হেক্টর প্রতি ফলন শীতকালে ৮৭ টন ও গ্রীষ্মকালে ৪৩ টন। পরিপক্ক অবস্থায় ফলের রং লাল ও গোলাকার। ভিটামিন সি (পরিপক্ক ফলে) ২২.৪৩ মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম ফ্রেশ ওজন। ফল মাংসল ও সুস্বাদু। ফল ২০-২৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষন করা যায়। জীবনকাল ১২০-১২৪ দিন। বিনাটমেটো-৭ সারা বছর চাষ করা যায়।

বিনাটমেটো-৮

উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছের উচ্চতা ১৩০-১৪০ সে.মি.। ফল কিছুটা লম্বাটে ধরনের। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৩১-৩৫ টি, প্রতি ফলের গড় ওজন ৭০-৭৫ গ্রাম এবং গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭৮ টন। এ জাতের জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন।

বিনাটমেটো-৯

উচ্চ ফলনশীল জাত। ফলের আকৃতি গোলাকার এবং মসৃণ। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৩৫-৪০ টি, প্রতি ফলের গড় ওজন ৭০-৭৫ গ্রাম এবং গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৮০ টন।। চারা লাগানো হতে ফল পাকা পর্যন্ত ১০০-১০৫ দিন সময় লাগে।

বিনাটমেটো-৮

বিনাটমেটো-৯

বিনাটমেটো-১০

থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং AVRDC থেকে সংগৃহীত টমেটোর চারটি কৌলিক সারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শীত মৌসুমে ফলন পরীক্ষা করে চারটি লাইন হতে একটি লাইন বাছাই করা হয়। উচ্চ

ভিটামিন-সি, সুমিষ্ট ও ফলন সন্তোষজনক হওয়ায় কৌলিক সারিটিকে ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বিনাটমেটো-১০ নামে দেশব্যাপী চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

বিনাটমেটো-১০

বিনাটমেটো-১০ এর গাছের গড় উচ্চতা ১৩৯-১৪৫ সে.মি.। পাতার রং গাঢ় সবুজ। ফল চেরী টাইপ ও থোকায় থোকায় হয়। ফলের স্বাদ সুমিষ্ট ও মাংসল। প্রতিটি গাছে ফলের সংখ্যা ৩০০-৩৫০ টি। প্রতিটি ফলের ওজন ৬-৭ গ্রাম। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৮০-৯৫ টন। ফলে ভিটামিন-সি এর পরিমাণ ২৩.০৯ গ্রাম/১০০ গ্রাম ফ্রেশ ওজন। ফল ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। চারা লাগানো হতে ফল পাকা পর্যন্ত ৭০-৭৫ দিন সময় লাগে।

বিনাটমেটো-১১ এবং বিনাটমেটো-১২

জাপান ও ফিলিপাইন থেকে সংগৃহীত টমেটোর পাঁচটি কৌলিক সারি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শীত মৌসুমে ফলন পরীক্ষা করে পাঁচটি লাইন হতে দু'টি লাইন বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে লাইন দু'টি গবেষণাগার ও দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়। উচ্চ ভিটামিন-সি ও অধিক ফলন দেয়ায় কৌলিক সারি দু'টিকে ২০১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক যথাক্রমে বিনাটমেটো-১১ ও বিনাটমেটো-১২ নামে দেশব্যাপী চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিনাটমেটো-১১

বিনাটমেটো-১১ এর গাছের গড় উচ্চতা ১১৫-১৩০ সে.মি.। পাতার রং হালকা সবুজ। ফলের আকার গোলাকার। প্রতিটি গাছে ফলের সংখ্যা ৪৫-৫০ টি। প্রতিটি ফলের ওজন ৯০-১০০ গ্রাম। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৯০-৯৫ টন। ফলে ভিটামিন-সি এর পরিমাণ ২৪.৩৯ গ্রাম/১০০ গ্রাম ফ্রেশ ওজন। ফল ২০-২২ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। চারা লাগানো হতে ফল পাকা পর্যন্ত ৭০-৭৫ দিন সময় লাগে ।

বিনাটমেটো-১২

বিনাটমেটো-১২ এর গাছের গড় উচ্চতা ১১৫-১২০ সে.মি.। পাতার রং সবুজ। ফলের আকার ডিম্বাকার। প্রতিটি গাছে ফলের সংখ্যা ৩৫-৪০ টি। প্রতিটি ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৯৫-১০০ টন। ফলে ভিটামিন-সি এর পরিমাণ ২৫.৬৪ গ্রাম/১০০ গ্রাম ফ্রেশ ওজন। ফল ২০-২৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। চারা লাগানো হতে ফল পাকা পর্যন্ত ৭০-৮০ দিন সময় লাগে ।

বিনাটমেটো-১৩

বিনাটমেটো-৭ জাতের বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি বিশিষ্ট নতুন একটি মিউট্যান্ট লাইন (TM-5) সনাক্ত করা হয়। তারপর গবেষণাগার এবং বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে কৃষকের মাঠে ৪-৫ বছর যাবৎ ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়। এ মিউট্যান্টটিকে বিনাটমেটো-১৩ নামে ২০১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক শীতকালে দেশব্যাপী চাষাবাদের জন্য ছাড় করা হয়েছে।

বিনাটমেটো-১৩

জাতটি শীতকালীন এবং বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভালো হয়। গাছের উচ্চতা ১২০-১৩০ সে.মি. এবং ফল গোলাকার। ফলের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম এবং পরিপক্ক অবস্থায় ফলের রং লাল। হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ ফলন ১০৪ টন এবং গড় ফলন ৮৭ টন। জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন।

টমেটোর উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

প্রায় সব ধরনের মাটিতেই এর চাষাবাদ করা যায়। তবে বেলে দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী।

জমি তৈরি

তিন চারটি চাষ ও মই দিয়ে সাধারণভাবে জমি তৈরি করতে হয়। শেষ চাষের আগে নির্ধারিত পরিমাণ গোবর সারের অর্ধেক ও পুরো টিএসপি ছিটিয়ে দিয়ে পুনরায় চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর চারা লাগানোর সময় গোড়ার মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ সমান দু'ভাগে ভাগ করে চারা লাগানোর ১৫ এবং ৩৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

বপন ও রোপণের সময়

টমেটো'র জন্য কার্তিক মাসের শুরু থেকে তৃতীয় সপ্তাহ (অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। কার্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ (নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ) পর্যন্ত চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত চারা লাগান চলে। বিনাটমেটো-২ এবং বিনাটমেটো-৩ মার্চের প্রথম থেকে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত (ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত) চারা রোপণ করা যায়। ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা জমিতে লাগাতে হয়। মার্চ-এপ্রিলের (ফাল্গুনের ২য় সপ্তাহ থেকে চৈত্রের ২য় সপ্তাহ) মধ্যে লাগালে ফলন বেশি হয়। এ জাত দু'টি শীতকালে আগাম রোপণ করলে আগাম ফলন পাওয়া যায় এবং অধিক মূল্য পাওয়া যায়। তবে বিনাটমেটো-৩ জাতটি শীতকালে আগাম চাষের অধিক উপযোগী।

বীজ হার

প্রতি হেক্টরে ৪৫০০০ টি, প্রতি একরে ১৮২০০ টি এবং প্রতি বিঘার জন্য ৬০০০ টি চারা প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি

টমেটোর বীজতলা তৈরি করতে মাটি ঝুরঝুরা করে তৈরি করতে হয়। জমি চাষ সম্পন্ন হলে ১০-১৫ সে. মি. উঁচু করে ১ মিটার চওড়া ও মাটি সমতল করে বেড তৈরি করতে হয়। সেচ দেয়ার সুবিধার্থে দু'টি বেডের

মাঝে মানুষ চলাচলের জন্য নালা রাখতে হবে। বীজের মধ্যে অনেক সময় রোগ জীবাণু লুকিয়ে থাকে যেমন আরলি বাইট, মোজাইক, উইল্ট ইত্যাদি রোগের জীবাণু। বীজ মাটিতে ফেলার পর পানি পেয়ে এসব রোগ জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে ফলে চারা মারা যায়। বীজতলার মাটিতেও রোগ জীবাণু থাকে যেমন ড্যাম্পিং অফ রোগের জীবাণু। এসব রোগ জীবাণু চারাকে আক্রমণ করতে পারে। তাই বীজতলার মাটিও শোধন করে নিলে ভাল হয়। বীজতলার মাটির উপর ৩-৪ সে. মি. ধানের খড়ের স্তর তৈরি করে পুড়িয়ে মাটি শোধন করা যায়। কয়েকটি পদ্ধতিতে বীজ শোধন করা যেতে পারে। ৫০ ডিগ্রী সেন্টিমেন্ট তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট বীজ ভিজিয়ে রাখলে বীজের গায়ের লেগে থাকা এবং ভিতরের রোগ জীবাণু মারা যায়। এরপর ভিজানো বীজ ছায়ায় শুকিয়ে বপন করতে হয়। এছাড়া প্রোভ্যাক্স ২ গ্রাম/কেজি হারে বীজের সাথে ভালভাবে মিশিয়েও বীজ শোধন করা যায়। রবি ও খরিফ মৌসুমে চারা তৈরির জন্য ২.৫-৩ কেজি/হেক্টর বীজের প্রয়োজন হয়। শোধিত বীজ হাতের মুঠোয় নিয়ে সমানভাবে ছড়িয়ে বা লাইন করে বীজতলায় লাগাতে হয়। বীজ বপনের পরে মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়। মাটিতে আর্দ্রতা কম থাকলে বীজতলায় পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে অনেক ক্ষেত্রে টমেটোর বীজ বপন করার পর পিঁপড়ায় বীজ নিয়ে যায়, ফলে অংকুরোদ্গম কম হয়। তাই সতর্কতা স্বরূপ বীজ তলায় সেভিন ডাস্ট বা গুঁড়া জাতীয় কীটনাশক ছিটিয়ে দিলে ঝুঁকি থাকে না।

সারের পরিমাণ

গ্রীষ্মকালীন টমেটোর (বিনাটমেটো-২ ও বিনাটমেটো-৩) জন্য

জমির পরিমাণ	সারের পরিমাণ						
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা	বোরন	গোবর সার
	(কেজি)						টন
হেক্টর প্রতি	২০০-২৫০	১৫০-২০০	১৭০-২৩০	৫০-৭৫	২.৫-৫	১.৫-৩	১০
একর প্রতি	৮০-১০০	৬০-৮০	৬৮-৯২	২০-৩০	১-২	০.৬-১.২	০৪

শীতকালীন টমেটোর এর জন্য

জমির পরিমাণ	সারের পরিমাণ						
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা	বোরন	গোবর সার
	(কেজি)						টন
হেক্টর প্রতি	২০০-২৫০	১৫০-২০০	১৭০-২৩০	৫০-৭৫	২.৫-৫	১.৫-৩	১০
একর প্রতি	৮০-১০০	৬০-৮০	৬৮-৯২	২০-৩০	১-২	০.৬-১.২	০৪

সার প্রয়োগ

সাধারণতঃ ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। শেষ চাষের আগে নির্ধারিত পরিমাণ গোবর সারের অর্ধেক ও পুরো টিএসপি ছিটিয়ে দিয়ে পুনরায় চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর চারা লাগানোর সময় গোড়ার মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া এবং পটাশ সমান দু'ভাগে ভাগ করে চারা লাগানোর ১৫ এবং ৩৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। ফুরাডান ৫-জি ২ গ্রাম প্রতি বর্গমিটার জমিতে ছিটিয়ে দিলে চারা কাটা পোকার আক্রমণ কম হবে।

রোপণ পদ্ধতি

জমিতে ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের চারা লাগান হয়। চারা লাগানোর সংগে সংগে চারায় পানি দিতে হবে। সারি হতে সারির দূরত্ব ৫০ সে.মি. এবং গাছ হতে গাছের দূরত্ব ৫০ সে.মি.। চারা লাগান ও লালন পদ্ধতি প্রচলিত অন্যান্য জাতের লালন পদ্ধতির অনুরূপ।

আন্ত:পরিচর্যা

প্রয়োজনবোধে জমির অবস্থা বুঝে হালকাভাবে ঝরণা দিয়ে গাছে পানি দিতে হবে। চারা লাগানোর পরে

জমিতে আগাছা দেখা দিলে নিড়ানি দিয়ে জমির মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে এবং হালকাভাবে আগাছাগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। ২য় কিস্তির সার প্রয়োগের পূর্বে পার্শ্বকুশিসহ মরা ও রোগাক্রান্ত পাতা ছাটাই করে দিলে রোগ ও পোকার আক্রমন কম হয়। গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সেজন্য বাঁশের কাঠি বা ধৈঞ্চার কাঠি গাছের সংগে বেঁধে দেয়া প্রয়োজন।

পলিথিন ছাউনি

গ্রীষ্মকালে বিশেষ করে ভরা বর্ষা মৌসুমে লাগানো চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরবর্তীতে ভাল ফলনের জন্য এবং অতিরিক্ত রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নৌকার ছৈ এর আকৃতি করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হবে।

রোগ ও পোকা-মাকড় দমন

রোগে টমেটোর ছত্রাক জনিত ঢলে পড়া, আগাম ধ্বসা, নাবী ধ্বসা রোগ দমনে রিডোরিল গোল্ড ২০ গ্রাম পানিতে অথবা রোভরাল ২ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ছিটাতে হবে। মোজাইক বা পাতা কোকড়ানো রোগ দমনে এডমায়াব বা টিডো ১০ মি: লি:/১০ লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড়: টমেটোর ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে ভলিভম দেখে ৫ মি: লি: অথবা ওস্তাদ ২০ মি: লি: প্রতি ১০ লি: পানিতে মিশিয়ে ছিটাতে হবে। শোষক পোকা/জাব পোকা দমনে এডমায়ার ১০ মি: লি: অথবা সেভিন ভাস্ট ২০ গ্রাম ১০ লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ

ডাসা ডাসা পাকা ফল প্রথমে তুলতে হবে। এ পাকা ফলগুলি ঘরে ২-৩ দিন রাখতে হবে যাতে ফলগুলি নরম হয়। এর ফলে বীজ সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। ফলগুলো নরম হলে দু'ভাগে কেটে বীজগুলি ১টি শুকনো কাঁচের অথবা প্লাষ্টিক পাত্রে ২৪ হতে ৪৮ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এরপর বীজগুলি পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালমত ধুয়ে মশারি নেটের সাহায্যে সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজগুলি ভাল করে রোদে শুকিয়ে কাঁচ বা প্লাষ্টিক পাত্রে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

লেবু

বিনালেবু-১

ভিয়েতনামের একটি স্থানীয় জাত হতে বিনালেবু-১ এর জার্মপ্লাজমটি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত জার্মপ্লাজমটি বিনা'র প্রধান কার্যালয়সহ উপকেন্দ্রসমূহে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে LVG-1 নামক কৌলিক সারিটি সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সারিটি লেবু চাষ উপযোগি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফলন সন্তোষজনক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে সারিটিকে বিনালেবু-১ নামে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

জাতটি সারা বছর ফলন দেয়। ফল ডিম্বাকার, ফলের অগ্রভাগ সূচাঁলো এবং ফল সুগন্ধিযুক্ত। পরিপক্ক অবস্থায় কিছু ফলে ২-৩ টি বীজ থাকতে পারে, তবে অধিকাংশ ফলই বীজ শূন্য থাকে। প্রতি ফলের ওজন ৯০-১৫০ গ্রাম। ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৩-০.৪ সে.মি.। একটি পরিপক্ক ফলে ৩৮ শতাংশ রস থাকে। কলমের চারা রোপনের সময় হতে ১০-১১ মাসের মধ্যে প্রথম ফলন পাওয়া যায়।

বিনালেবু-১

বিনালেবু-২

ভারতের একটি স্থানীয় জাত হতে বিনালেবু-২ এর জার্মপ্লাজমটি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত জার্মপ্লাজমটি বিনা'র প্রধান কাযালয়সহ উপকেন্দ্রসমূহে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে CL-1 নামক কৌলিক সারিটি সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সারিটি লেবু চাষ উপযোগী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফলন সন্তোষজনক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড ২০২০ সালে সারিটিকে "বিনালেবু-২" নামে কৃষক পযায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

সারা বছর ফল দেয়। ফল ডিম্বাকৃতি থেকে সিলিন্ডাকৃতির, ফলের অগ্রভাগ সূচাঁলো, বহিরাবণ মাঝারি মসৃণ এবং সুগন্ধিযুক্ত।
পরিপক্ক অবস্থায় কিছু ফলের ৩ থেকে ৪ টা বীজ থাকে কিন্তু অধিকাংশই বীজ শূন্য। ফলের ওজন ১৩০-১৭০ গ্রাম। ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০৩৫-০৪৫ সে.মি.।
ফলে ভিটামিন সি এর পরিমান ৩০ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম এবং রসের পরিমাণ খুব বেশী, ৩৫%।
কলমের চারা রোপনের সময় থেকে ১১ মাসের মধ্যে ১ম ফলন পাওয়া যায়।
এক বছরের একটি গাছে ১৩০-১৭০ টি ফল পাওয়া যায়।
উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতের ফলন ৩৫-৫০ টন/হেক্টর পাওয়া যায়।

বিনালেবু-২

প্রচলিত জাতের তুলনায় বৈশিষ্ট্যঃ

বিনালেবু-২ লেবুর ফলন প্রচলিত জাতের তুলনায় বেশী এবং প্রায় সারা বছরব্যাপী লেবু পাওয়া যায় এবং লেবু সুগন্ধিযুক্ত।

মসলা ফসল

রসুন

রসুন (*Allium sativum* L.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কন্দ জাতীয় মসলা ফসল। ঠান্ডা ও মৃদু জলবায়ু রসুন চাষের জন্য উপযোগি এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে রসুন ভাল জন্মায়। এ ফসল খুব শীত বা খুব বেশি গরম সহ্য করতে পারে না। তাপমাত্রা বেশি হলে রসুনের কোয়া দানা বাধতে পারে না বিধায় রসুন বৃদ্ধির জন্য ঠান্ডা আবহাওয়া এবং কন্দ পরিপক্ক হওয়ার জন্য বড়দিন এবং কিছুটা শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশে শীতকালে রসুনের চাষ করা হয়। ১৩-২৪° সে. তাপমাত্রায় রসুন চাষের জন্য উপযোগী।

বিনারসুন-১

জাতটি ২০১৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়। এ জাতটি নদিয়া, ভারত থেকে সংগ্রহ করা হয়। নদিয়া, ভারত থেকে ৩টি জেনোটাইপ সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে এসি-৫ জেনোটাইপটির ফলন বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্যান্য জাতের তুলনায় অনেক বেশি এবং রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ অনেক কম হওয়ায় জেনোটাইপটি বিনারসুন-১ নামে নিবন্ধন করা হয়।

বিনারসুন-১ এর গাছের উচ্চতা ৭৫-৮০ সে.মি. প্রতিটি গাছে পাতার সংখ্যা ১১-১৪ টি। রোগ ও পোকার আক্রমণ খুব কম। জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন। উচ্চ ফলনশীল ও ভাল সংরক্ষণ গুণাগুণ সম্পন। প্রতিটি বাল্বের গড় ওজন ২৬.২৫ গ্রাম এবং হেক্টর প্রতি ফলন ১৩-১৫ টন।

মাঠে বিনারসুন-১

বিনারসুন-১ এর বাল্ব

রসুনের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোঁ-আশ মাটি রসুন চাষের জন্য উত্তম। যে মাটির পিএইচ মাত্রা ৬-৭, সেই মাটিতে রসুন সবচেয়ে ভাল হয়। বেলে মাটিতে রসুন খুব একটা ভাল হয় না। উচ্চ ক্ষারীয় লবণাক্ত মাটি রসুনের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়।

জমি তৈরী

সাধারণত ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝরা করে জমি তৈরী করতে হয়। জমিতে আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে জমি সমতল করে বেড তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে এক বেড থেকে অন্য বেডের মাঝে পানি নিষ্কাশনের জন্য ৫০ সে.মি. প্রশস্থ নালা রাখতে হবে।

রোপনের সময়

জমির দৈর্ঘ্য বরাবর ১-১.৫ মিটার প্রস্থ বেড তৈরি করে প্রতি দুই বেডের মাঝে ৫০ সে.মি. চওড়া নালা রাখলে সেচ ও নিষ্কাশনে সুবিধা হয়। কোয়া থেকে কোয়া ১০-১৫ সে.মি. এবং লাইন থেকে লাইন ১৫-২০ সে.মি. দূরত্বে ২.৫-৩.০ সে.মি. গভীরে রসুনের কোয়া রোপন করতে হয়। তাছাড়া রসুন নিম্নলিখিত দু'ভাবেও রোপন করা যেতে পারে-

- ডিবলিং পদ্ধতিঃ নরম মাটি যুক্ত জমিতে সুতা দিয়ে লাইন করে কোয়া মাটির নিচে পুঁতে দেওয়া।
- ফারো (নালা) পান্টিং পদ্ধতিঃ সুনিষ্কাশিত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর দোঁআশ মাটিতে ছোট লাঙ্গল দিয়ে সোজা নালা তৈরি করে রসুন রোপন করা যায়। তবে ফারো রোপন পদ্ধতিই রসুন চাষের জন্য উত্তম।

বীজ হার

রসুনের কোয়া বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রসুনের কন্দ হাত ভেঁঙ্গে এই কোয়া পৃথক করা হয়। এক্ষেত্রে কন্দের বাহিরের অংশের কোয়াগুলোই বীজ হিসাবে ব্যবহার করা ভাল। গবেষণায় দেখা গেছে, ০.৯-১.২ গ্রাম রসুনের কোয়া বীজ হিসাবে ব্যবহার করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। এর চেয়ে ছোট আকারের কোয়া বপন করলে ফলন কমে যায় এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভজনক হয় না। তাই পূর্ববর্তী বছরের উৎকৃষ্ট রসুন থেকে বড় বড় কন্দ বেছে বীজের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত। কোয়ার আকার অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ৫০০-৭০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

সারের পরিমাণ

ভাল ফলন পেতে হলে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হয়। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে ফলন বেশি হয়। বিনারসুন-১ চাষের জন্য নিম্নোক্ত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)		
	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি	বিঘা প্রতি
ইউরিয়া	৩০০	১২১	৪০
টিএসপি	২০০	৮১	২৭
এমওপি	৩০০	১২১	৪০
জিপসাম	১০০	৪১	১৪
বোরন	১০	৪	১.৫
পঁচা গোবর	৫ টন	২ টন	৬৬৭

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, বোরন এবং অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়া ও এমওপি সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি দুই কিস্তিতে সমান ভাবে বীজ বপনের ২৫ দিন এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। কুয়াশা সম্পন্ন দিনে জমিতে ছাই প্রয়োগ করা ভাল। ছাই প্রয়োগে মাটি আলগা থাকে এবং ফলন বৃদ্ধি পায় এবং মাটিতে পটাশিয়ামের পরিমান বৃদ্ধি পায়।

আন্তঃপরিচর্যা

কচুরিপানা দ্বারা ৪-৫ সে.মি. পুরু করে মালচ তৈরি করলে রসুনের ফলন ভাল হয়। এ ক্ষেত্রে বেশি সেচের প্রয়োজন হয় না। মালচ দেওয়ার কারণে মাটি আর্দ্র থাকে ও আগাছার পরিমাণ কম হয়। রসুনের কোয়া বপনের পর ৩-৪ দিনের মধ্যে সেচ দিলে অংকুরোদগম ভাল হয়। জমি নিয়মিত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। এর ফলে মাটির রস সংরক্ষিত হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে এ সমস্ত কাজের সময় রসুনের শিকড়ের যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয়।

সেচ

রসুনের কোয়া বপন করেই একবার সেচ দিতে হয়। পরবর্তীতে জমির রস বুঝে ১৫-২৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। রসুনের জমিতে বিশেষ করে, কন্দ গঠণের সময় উপযুক্ত পরিমাণে রস থাকা দরকার। এ সময় অবশ্যই একবার সেচ দিতে হবে। কন্দ যখন পরিপক্ক হতে থাকে, তখন সেচ কম দিতে হয়। রসুন চাষে মোটামুটি ৮-১০ টি সেচের দরকার হয়। ড্রেনের দু'পাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেওয়া সুবিধাজনক। নালা দিয়ে সমভাবে ও সহজেই সেচ দেয়া যায় এবং অতিরিক্ত পানি থাকলে তা বের করে দেওয়া যায়। সেচের পর জমিতে জোঁ আসলে মাটি নিড়ানি দিয়ে ঝুরঝুরা করে দিতে হয় এবং মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হয়।

রোগ ও পোকা-মাকড় দমন

বিনারসুন-১ জাতে স্টেমফাইলাম, লিফ ব্লাইট রোগের সংক্রমণ কম হয়। তবে রোগের অনুকূল আবহাওয়ার কারণে মাঝে মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগ হতে পারে। এ রোগের ফলে পাতার উপর কিনারায় ছোট ছোট সাদাটে গোল দাগ দেখা যায় যা পরবর্তীতে হলদে ও বড় বাদামী রং ধারণ করে শুকিয়ে খড়ের রং হয়। এ রোগ দমনের জন্য ডাইথেন এম-৪৫ অথবা রোভরাল ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর পাতায় স্প্রে করা যেতে পারে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তাই কুয়াশা বেশি হলে ৭ দিন পর পর ৩-৪ বার ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। অনেক সময় পটাশিয়ামের অভাবে রসুনের পাতার ডগা শুকিয়ে যায়। এ অবস্থা দেখা দিলে মূল সার হিসাবে পটাশিয়াম দেওয়া ছাড়াও পরবর্তীতে পটাশিয়াম সার দিলে ডগা শুকিয়ে যাওয়া রোধ করা যায়। রসুন সাধারণত থ্রিপস, রেড স্পাইড়ার ও মাইট দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ পোকা দমনের জন্য ম্যালথিয়ন/ডেসিস/সাইপেরিন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫ মি.লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা সহজেই দমন করা যায়।

রসুন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বিনারসুন-১ রোপণের ১৩০-১৪০ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত রসুন রোপণের ৯০-১০৫ দিন পর কন্দ পুষ্ট হয়ে পরিপক্ক হতে শুরু করে। রসুন পরিপক্ক হলে পাতার অগ্রভাগ হলদে-বাদামী হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে এবং পাতা ভেঙ্গে যায়। কন্দের বাইরের দিকের কোয়াগুলি পুষ্ট হয়ে লম্বালম্বিভাবে ফুলে উঠে এবং দুইটি কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যায়। এ সময় রসুন তোলার উপযুক্ত সময়। রসুন সংগ্রহের ৫-৭ দিন আগে রসুনের বেডের উপর থেকে কান্ড ভেঙ্গে দিলে রসুনের ফলন ভাল হয়। বৃষ্টি মুক্ত দিনে রসুনের গাছ হাতে টেনে তুলে মাটি পরিস্কার করতে হয়। রসুন সংগ্রহের পর ৫-৭ দিন টানা রোদে শুকাতে হয়। পরে পরিমাণ মত (৪-৫ কেজি) রসুনের শুকানো গাছ বেনি তৈরি করে ঝুলিয়ে রেখে রসুন সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া উত্তোলনের পর পাতা ও শিকড় কেটে ব্যাগে বা বাঁশের র‍্যাক বা মাচায় সংরক্ষণ করা যায়।

মরিচ

বিনামরিচ-১

চীনের স্থানীয় জাত থেকে ২০১২ সালে মরিচের একটি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়। এ কৌলিক সারিটির বীজে সাইবারডরফ ল্যাবরেটরী, ভিয়েনা, অষ্ট্রিয়ায় বিভিন্ন মাত্রার রেডিয়েশন প্রয়োগ করার পর একটি মিউট্যান্ট লাইনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আশানুরুপ হয়। মিউট্যান্টটি বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবেশ অঞ্চলে ৪-৫ বছর যাবৎ শীত মৌসুমে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তুলনামূলক ফলন মূল্যায়ন করা হয়। মিউট্যান্টটির ফলন অন্যান্য জাত থেকে বেশি হওয়ায় শীত মৌসুমে রোপনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৭ সালে মিউট্যান্টটি বিনামরিচ-১ নামে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হয়।

এ জাতের মরিচের গাছ খর্বাকৃতির, গাছ খাড়া, পাতা গাঢ় সবুজ এবং চওড়া, ফল অনেক লম্বা (১১ সে.মি. - ১৬ সে.মি.) ও চওড়া। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৪৫ - ৫৫ সে.মি. এবং প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ২০০ থেকে ২৫০ টি। চারা লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গাছে ফুল আসা শুরু করে এবং পরবর্তী ২৮ দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ পাওয়া যায়। সাধারণত এভাবে ৮-৯ বার ফসল তোলা যায়।

মাঠে বিনামরিচ-১

বিনামরিচ-১

বিনামরিচ-১ জাতের মরিচের ফলন প্রচলিত জাতের তুলনায় অনেক বেশী এবং একইসাথে মসলা, সালাদ এবং সবজি হিসেবে ব্যবহার উপযোগী। ঝাল (পানজেন্সী) মাঝারি ধরনের ও সুগন্ধিযুক্ত। গাছ আকারে খাট ও ঝোপালো। প্রথম মরিচ সংগ্রহের পর গাছে ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতের ফলন (গ্রিনচিলি) হেক্টর প্রতি ৩৪-৩৮ টন পাওয়া যায়। জাতটি স্থানীয় জাতের তুলনায় প্রায় ১৫০% বেশী ফলন দেয়।

বিনামরিচ-২

উদ্ভাবনের ইতিহাস

অগ্রবর্তী লাইন IndoCF-25-1 ২০১৭ সালে ইন্দেনেশিয়ার একটি স্থানীয় জাত থেকে কৌলিক সারি হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত সারিটি বিনা'র প্রধান কাযালয়সহ অন্যান্য উপকেন্দ্রসমূহ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রবি এবং খরিপ মৌসুমে প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যয়ন করা হয়। উক্ত লাইনটির শীত মৌসুমে উচ্চফলনশীলতা, পানজেনসি, মরিচের গুরুত্বপূর্ণ রোগবালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমন সহনশীলতা এবং খরিপ মৌসুমে টিকে থাকার ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। সন্তোষজনক ফলন, রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের প্রতি সহনশীলতা, সংরক্ষণক্ষমতা এবং পরিমিত ঝাল হওয়ায় IndoCF-25-1 লাইনটিকে ২০২০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড বিনামেরিচ-২ নামে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

বিনামরিচ-২ এর বৈশিষ্ট্যাবলী

- উচ্চ ফলনশীল, প্রচলিত জাতের তুলনায় ফলন প্রায় ১৫ গুণ বেশী।
- গাছ লম্বা, ঝোঁপালো এবং প্রচুর শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হয়।
- ফল কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ এবং পাকা অবস্থায় আকর্ষনীয় লাল রংয়ের হয়ে থাকে।
- কাঁচা মরিচের ঝাল বেশি, ফল সুগন্ধিযুক্ত এবং

মাঠে বিনামরিচ-২

বিনামরিচ-২

ত্বক পুরু।

- প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ১৫০-২০০ টি, ফলের দৈর্ঘ্য ১০-১৫ সে.মি. এবং প্রস্থ ৩-৪৫ সে.মি.।
- কাঁচা মরিচ সংগ্রহের ৮-১০ দিন পযন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার উপযোগী।
- প্রথম মরিচ সংগ্রহের পর ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- জীবনকাল ১৮০-২১০ দিন, ফলন ২৯-৩২ টন/হে।

মরিচের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

এ জাতটি চাষের জন্য জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে দো-আঁশ মাটি উপযোগী। তবে স্বল্প মাত্রার অম্লীয় (পিএইচ ৬-৭) মাটিতে ফলন ভাল হয়।

জমি তৈরী

তিন থেকে চারটি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে জমি তৈরী করতে হবে। শেষ চাষের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য ২৫-৩০ সে.মি. প্রশস্থ নালার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সারের পরিমান

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)		
	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি	বিঘা প্রতি
ইউরিয়া	২২০	৯০	৩০
টিএসপি	৪০০	১৬৫	৫০
এমওপি	২০০	৮৫	২৫
জিপসাম	১০০	৪৫	১৫
পচা গোবর	৫০০০	২০০০	৬০০-৭০০
জিপসাম	১০০০	৪০	১৩
জিংক সালফেট	১০	৪	১-১৫০

সম্পূর্ণ পঁচা গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, ১/৩ ইউরিয়া ১/৩ ভাগ পটাশ সার জমি শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করতে হবে। পরে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ সার ৪০-৫৫ দিন ও ৭০-৭৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপন

আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ হতে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি (মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে শেষ সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য নভেম্বর) পর্যন্ত একমাস বয়সী চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত চারা রোপন করা যায়।

বপন পদ্ধতি

বীজতলায় (দৈর্ঘ্য ১০০ সে.মি. প্রস্থ ১০ সে.মি. ও উচ্চতা ২০ সে.মি.) চারা তৈরী করে ৩২-৩৫ দিন বয়সের চারা জমিতে রোপন করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪৫-৫০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব

৩৫-৪০ সে.মি. হলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। বীজতলার চারপাশে সেভিনডাষ্ট বা গুড়া জাতীয় কীটনাশক ছিটিয়ে দিলে পিঁপিলিকার উপদ্রব থাকে না। বৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিলে পলিথিনের ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজ হার

ছিটিয়ে বপন করলে প্রতি হেক্টরে ৮০০-১০০০ গ্রাম এবং সারিতে চারা রোপন করলে প্রতি হেক্টরে ৪৫০-৬০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। প্রতি হেক্টরে চারার সংখ্যা ৩৮০০০টি, প্রতি একরে ১৫৫০০টি এবং প্রতি বিঘায় ৫০০০টি চারার প্রয়োজন হয়।

আন্তঃপরিচর্যা

জমির প্রকারভেদে চারা রোপনের পর হতে ৩-৫ বার সেচের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ চারা রোপনের পর ঝরনা দিয়ে গাছে পানি দিতে হবে। সেচের কয়েকদিন পর মাটিতে চটা দেখা যায়, এই চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে আগাছা হলে নিড়ানী দিয়ে হালকাভাবে আগাছা পরিস্কার করে ফেলতে হবে এবং একই সময় মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে।

রোগ ও পোকা-মাকড় দমন

বিনামরিচ-১ জাতটি দেশের বিভিন্ন মসলা উৎপাদনকারী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন ক্ষতিকারক পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায়নি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ্যানথ্রাকনোজ রোগ, থ্রিপস এবং জাবপোকার প্রতি সহনশীলতা লক্ষ্য করা গেছে। এনথ্রাকনোজ রোগের জন্য বপনের পূর্বে বীজকে প্রোভ্যাক্স-২০০ প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। মাঠে রোগ দমনের জন্য ডাইথেন এম-৪৫ অথবা রোভরাল (২ গ্রাম/লিঃ পানি) ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। থ্রিপস ও জাব পোকার জন্য ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি ১০ লিঃ পানিতে ২৫ মি.লি. হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। পোকার প্রাদুর্ভাব বেশি হলে ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণ

চারা লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গাছে ফুল আসা শুরু করে এবং পরবর্তী ২৮ দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ সংগ্রহ করা যায়। সাধারণতঃ এভাবে ৮-৯ বার ফসল সংগ্রহ করা যায়। যেহেতু বিনামরিচ-১ আকারে বড় এবং মাংসল, সেহেতু বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাকা মরিচগুলো সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গে কেটে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ শক্ত মাটির উপরে বা পাকা মেঝে অথবা টিনের চালে বিছিয়ে সূর্যের আলোতে শুকাতে হবে। বীজের মান সঠিক রেখে শুকানোর জন্য মাঝে মাঝে রৌদ্রের মধ্যে মরিচ বীজ নেড়ে দিতে হবে যাতে ছত্রাক জন্মাতে না পারে। পুষ্ট বীজ, উচ্চ অংকুরোদগম ক্ষমতা, উজ্জ্বল রং এবং অণুজীবের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য আর্দ্রতা ৮-১০% এর মধ্যে রাখতে হবে। বীজ বায়ুরোধী টিনের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

পিঁয়াজ

বিনাপিঁয়াজ-১ ও বিনাপিঁয়াজ-২

গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজের জাত বারি পিঁয়াজ-২ এর বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে তার বংশগতিতে স্থায়ী পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে দু'টি মিউট্যান্ট পাওয়া যায়। পরবর্তীতে কৃষক ও গবেষণা মাঠে পরীক্ষণে দেখা যায় যে, মিউট্যান্ট দু'টি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাতৃজাত বারি পিঁয়াজ-২ ও চেক জাত বারি পিঁয়াজ-৩ এর চেয়ে

অধিক কন্দ ও বীজ উৎপাদনে সক্ষম বিধায় মিউট্যান্ট দু'টিকে জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৮ সালে বাণিজ্যিকভাবে খরিফ-১ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিনাপিঁয়াজ-১ ও বিনাপিঁয়াজ-২ নামে অনুমোদন দেয়।

বিনাপিঁয়াজ-১

বিনাপিঁয়াজ-২

জাত দু'টি একবর্ষজীবি অর্থাৎ একই বছরে বীজ থেকে বীজ উৎপাদন করে। এদের বীজ শীতকালে ও কন্দ খরিফ-১ মৌসুমে উৎপাদন করতে হয়। বিনাপিঁয়াজ-১ ও বিনাপিঁয়াজ-২ এর জীবনকাল বীজ থেকে বীজ পর্যন্ত যথাক্রমে ১৮০-১৯০ দিন ও ২১০-২১৫ দিন। বীজ থেকে কন্দ পেতে দু'টি জাতের সময় লাগে ১১০-১২০ দিন। উভয় জাতের প্রতিটি কন্দের ওজন ১৫-২০ গ্রাম। বিনাপিঁয়াজ-১ এর কন্দ লম্বাটে ও বেগুনি নীল বর্ণের এবং বিনাপিঁয়াজ-২ এর কন্দ গোলাকার এবং লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট। বিনাপিঁয়াজ-১ এর কন্দের ফলন ৮.২-১০ টন/হেক্টর এবং বীজের ফলন ৬৩৫-১১৬০ কেজি/হেক্টর। বিনাপিঁয়াজ-২ এর কন্দের ফলন ৮.৬৮-৯.৪৫ টন/হেক্টর এবং বীজের ফলন ৭০০-১৩৭০ কেজি/হেক্টর।

পিঁয়াজের উৎপাদন প্রযুক্তি

চাষ উপযোগী জমি

পিঁয়াজ চাষের জন্য হালকা বুনটের মাটি বেশি উপযোগী। পলি, পলি দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটি বিশিষ্ট উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না বা নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এমন জমি পিঁয়াজ চাষের উপযোগী।

বীজবাছাই, শোধন ও বীজের হার

ভাল ফলন পেতে হলে সতেজ ও পুষ্ট বীজ বাছাই করে প্রোভ্যাক্স-২০০ ছত্রাকনাশক দ্বারা কেজি প্রতি ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। প্রতি হেক্টরে ৬-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ তলায় বীজ বপণের সময়

রবি (বীজের জন্য): মধ্য অক্টোবর-নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ।
খরিপ-১ (কন্দ উৎপাদনের জন্য): মধ্য জানুয়ারি।

রোপণ পদ্ধতি

বীজতলায় চারা তৈরি করে রোপণ অথবা সেট রোপণ।

চারা রোপণ : রবি (বীজের জন্য)

ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ হতে মধ্য ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণের তৃতীয় হতে চতুর্থ সপ্তাহ) পর্যন্ত। চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ১৫ সে.মি. (৬ ইঞ্চি) এবং সারি থেকে সারি ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) দূরে থাকতে হবে।

খরিপ-১ (কন্দ উৎপাদনের জন্য)

মধ্য ফেব্রুয়ারি হতে মার্চের ১ম সপ্তাহ (ফাল্গুনের ১ম হতে ২য় সপ্তাহ) পর্যন্ত। চারা হতে চারার দূরত্ব ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) ও সারি হতে সারি ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) দূরে থাকতে হবে।

সেট রোপণ: খরিপ-২ (কন্দ উৎপাদনের জন্য)

বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে আগস্টের শেষ সপ্তাহ হতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি (ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় হতে শেষ সপ্তাহ) পর্যন্ত। উভয় ক্ষেত্রে ২০-৩০ সে.মি. (৮-১২ ইঞ্চি) উঁচু ও ২ মিটার (৬.৫ ফুট) প্রস্থের প্রয়োজনমত লম্বা বেডের উপর চারা/সেট থেকে চারা/সেটের দূরত্ব হবে ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) এবং সারি থেকে সারি ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) দূরে থাকতে হবে।

জমি তৈরী

৪-৫টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে নিতে হবে। আগাছা থাকলে তা উপরে ফেলতে হবে, মাটির ঢেলা থাকলে ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং সমান করে জমি তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

মাটিতে প্রয়োজনীয় জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে পিঁয়াজের আকার বড় হয় এবং অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। মাটির অবস্থাভেদে সারের মাত্রা নির্ভর করে। এখানে মধ্যম উর্বর জমির জন্য সারের মাত্রা দেওয়া হলো:

সারের নাম	বীজ উৎপাদনের জন্য	কন্দ উৎপাদনের জন্য
	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	৩২০	১৭৫-২১৫
টিএসপি	৪১৫	১৫০-২২৫
এমওপি	১৭০	১৬০-২০০
জিপসাম	১১০	১৩০-১৬৫
জিংক অক্সাইড	৩	৫.৫
বরিক এসিড	১১.৭৫	৫.৮৮
গোবর	৫০০০	৫০০

গোবর সার রোপণের ২ সপ্তাহ আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া, ১/২ ভাগ এমওপি এবং সমস্ত টিএসপি, জিপসাম ও জিংক অক্সাইড সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। কন্দ উৎপাদনের জন্য বাকী ২/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং ১/২ ভাগ এমওপি সমান ভাগে যথাক্রমে চারা রোপণের ২৫ এবং ৪৫ দিন পর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ উৎপাদনের জন্য ইউরিয়া ও এমওপি সার যথাক্রমে শেষ চাষে, গাছের ২০ দিন, ৪০ দিন ও ৬০ দিন বয়সে প্রয়োগ করতে হবে।

আন্ত:পরিচর্যা

আগাছা পিঁয়াজের বৃদ্ধির অন্যতম অন্তরায়। সাধারণত পানি সেচ দেওয়ার পর আগাছা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই এ সময়ে নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এতে বাল্ব ভালোভাবে গঠিত হবে এবং ফলনও বাড়বে। তাছাড়া ভালো ফলন পেতে প্রথম সেচ চারা রোপণের পর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেচ যথাক্রমে রোপণের ২০ ও ৪০ দিন পরে দেয়া প্রয়োজন।

বীজ উৎপাদন মাঠের স্বাতন্ত্রীকরণ

পিঁয়াজ একটি পর-পরাগায়িত উদ্ভিদ। পোকা বা বাতাসের দ্বারা প্রধানত এর পরাগায়ণ ঘটে থাকে। এ কারণে জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এক জাতের সাথে অন্য জাতের দূরত্ব ন্যূনতম ১ কিলোমিটার হতে হবে।

রোগবালাই ও পোকামাকড়

খরিফ-১ মৌসুমে অর্থাৎ কন্দ উৎপাদন মৌসুমে এ জাত দু'টিতে তেমন কোন পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় না। তবে শীতকালে পার্পল ব্লচ (Purple Blotch) ও কান্ড পঁচা (Leaf Blight) রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এ রোগদ্বয় ব্যবস্থাপনার জন্য সুস্থ, নীরোগ বীজ ও চারা ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত গাছের পরিত্যাক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। পার্পল ব্লচ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম রোভরাল বা অটোয়াল এবং ২ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর ৫-৬ বার স্প্রে করতে হবে। কান্ড পঁচা রোগের জন্য ভিটাভেক্স-২০০ অথবা ব্যাভিষ্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। আক্রান্ত জমিতে প্রতি বছর পিঁয়াজ চাষ না করে অন্য ফসলের সাথে শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।

পোকা-মাকড়ের মধ্যে থ্রিপস পোকা বীজ উৎপাদনে প্রধান অন্তরায়। এ পোকা আক্রান্ত পাতায় রূপালী রং এর অথবা বাদামী দাগ দেখা যায়। পরবর্তিতে পাতা শুকিয়ে বিকৃত হয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে। সাবান মিশ্রিত পানি ৪ গ্রাম/ লিটার হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা কেরাত/ এডমায়ার প্রতি লিটার পানিতে ১ মি.লি. হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

কন্দ ও বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ

গাছ পরিপক্ক হলে পাতা ক্রমশ হল্‌দে বর্ণ ধারণ করে এবং গলার দিকের টিস্যু নরম হয়ে যায়। শতকরা ৫০-৬০ ভাগ গাছে পরিপক্কতা আসলে ফসল উত্তোলন করে পাতা ও শিকড় কেটে ছায়াময় ও শীতল স্থানে ৫-৭ দিন রেখে কিউরিং করতে হবে। এরপর ভালো পিঁয়াজগুলো বাছাই করে ঘরের মেঝে থেকে একটু উচ্চতায় বাঁশ বা পাষ্টিকের মাচায় রেখে সংরক্ষণ করতে হবে।

বীজ পরিপক্ক হলে কদমের মুখ ফেটে যায় এবং কালো বীজ দেখা যায়। শতকরা ২০-২৫ ভাগ গাছে পরিপক্কতা আসলে ফসল উত্তোলন শুরু করতে হবে। একই সময়ে সব পুষ্পদন্ডের বীজ পরিপক্ক হয় না। এজন্য ২-৩ বার বীজ তোলা হয়। পুষ্পদন্ডের নিচ থেকে কদমের ৫-৭ সে.মি. অংশসহ পরিপক্ক কদমগুলো তুলতে হয়। তোলার পর কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে প্রথমে বীজ থেকে খোসা আলাদা করতে হবে। এরপর বীজ পরিষ্কার করে পুনরায় রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ৫-৭% এ কমিয়ে আনতে হবে। তারপর শুষ্ক ও ছায়াযুক্ত স্থানে বীজ ঠান্ডা করে বায়ুরোধক পলিথিন ব্যাগ, টিন অথবা পাষ্টিকের পাত্রে ভরে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

হলুদ

বিনাহলুদ-১

বিনাহলুদ-১ একটি আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাত, প্রচলিত জাতের তুলনায় ফলন দ্বিগুণ। গাছ লম্বা আকৃতির, পাতা গাঢ় সবুজ এবং লম্বা। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২৫-১৩৫ সে.মি.। পাতার সংখ্যা ১৬-২২টি এবং পাতার দৈর্ঘ্য ৫৫-৬৫ সে.মি.। প্রতি গাছে ছড়ার সংখ্যা ২৮-৩৫ টি। ছড়া ১২-১৫ সে.মি. লম্বা এবং ৩-৫ সে.মি. চওড়া। প্রতি গাছে হলুদের গড় ওজন ৮৫০-১০০০ গ্রাম। শাঁস আকর্ষনীয় গাঢ়

মাঠে বিনাহলুদ-১

বিনাহলুদ-১

হলুদ ও শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ শতকারা ৩৮-৪৫ ভাগ। লিফব্লচ এবং রাইজোম রট রোগ সহনশীল। বপনের ৩৩০ দিনের মধ্যে ফলন সংগ্রহ করা যায়। জাতটি হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ৩০-৩৩ টন।

হলুদ উৎপাদন প্রযুক্তি

চাষ উপযোগী জমি

বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ মাটি হলুদ চাষের জন্য উপযোগী। মাটি গভীরভাবে ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাটি যাতে ঝুরঝুরে হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শেষ চাষের আগে ফুরাডান ৫জি হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি করে প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্যই সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা থাকতে হবে।

রোপণের সময়

সাধারণত মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে পর্যন্ত হলুদের কন্দ রোপণ করতে হয়।

বীজের হার এবং বীজ শোধন

হেক্টর প্রতি ২.০-২.৫ টন কন্দের (রাইজোম) প্রয়োজন হয়। বীজবাহিত বিভিন্ন রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কন্দ শোধন করে নেয়া উচিত। রোপনের ৪-৬ ঘন্টা আগে ব্যাভিষ্টিন/স্কোর ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে কন্দ ৩০-৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, তারপর পানি থেকে কন্দ তুলে নিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে তৈরিকৃত জমিতে রোপণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

জমিতে ৬০ সে.মি. পরপর সারি টেনে সারিতে ২৫ সে.মি. পরপর ৫-৭ সে.মি. গভীরে বীজ কন্দ রোপণ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝখানে ৬০ সে.মি. প্রশস্থ নালা রাখতে হবে। পরবর্তীতে দুই বেডের মাঝের নালা থেকে মাটি উঠিয়ে গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

হেক্টর প্রতি সারের মাত্রা- গোবর ৫ টন, ইউরিয়া ২২০ কেজি, টিএসপি ১২০ কেজি, এমপি ২২০ কেজি, জিপসাম ১০০ কেজি এবং বোরাক্স এসিড ২ কেজি। মাটির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে। শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, বোরাক্স এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া এবং এমপি সার সমান দুই কিস্তিতে ৭০-৮০ দিন এবং ১০০-১২০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

হলুদের জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে জমির অবস্থা বুঝে ৩-৪ বার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। পানি নিষ্কাশন এবং রাইজোমের সঠিক বৃদ্ধির জন্য ২-৩ বার হলুদের দুই সারির মাঝখান থেকে মাটি তুলে গাছের গোড়ায় দিতে হবে এতে কন্দের বৃদ্ধি ভাল হবে। মাটি শুষ্ক হলে হালকা সেচ দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে পানি কোনভাবেই জমিতে না জমে থাকে। জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে রস সংরক্ষণ এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য মালচিং (শুকনো পাতা বা খড়) দিতে হবে। এতে করে আগাছার পরিমাণও কম হবে।

রোগবালাই এবং পোকামাকড়

রোগবালাই এবং পোকামাকড় এর আক্রমণ প্রচলিত জাতের তুলনায় অনেক কম। এ জাতটি লিফব্লচ এবং রাইজোম রট রোগ সহনশীল। হলুদের পাতা লিফব্লচ আক্রান্ত হলে সাধারণত শুকিয়ে যায়, ফলে গাছ খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না, ফলন কমে যায়। এ অবস্থা হলে রোগ দেখা দেয়া মাত্রই ছত্রাকনাশক যেমন- অটোস্টিন ২ গ্রাম অথবা ফলিকুর ১ মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করে সম্পূর্ণ পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। হলুদে কন্দ পঁচা রোগের আক্রমণ হলে গাছের নিচের দিকের পাতা হলুদ হতে থাকে এবং পুরো গাছ শুকিয়ে মারা যায়। আক্রান্ত গাছ হাত দিয়ে টান দিলে সহজেই উপরে উঠে আসে। সুস্থ কন্দ বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বীজ শোধন অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ অবস্থা হলে রোগ দেখা দেয়া মাত্রই ছত্রাকনাশক যেমন- অটোস্টিন ২ গ্রাম অথবা ফলিকুর ১ মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করে সম্পূর্ণ পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

গাছের উপরের অংশ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে সাধারণত বপনের ৩৩০ দিনের মধ্যে ফলন সংগ্রহ করা যায়। ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি উপযুক্ত সময়। কোদায় দিয়ে কুপিয়ে মাটি আলগা করে হলুদের কন্দ সংগ্রহ করতে হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে কন্দ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কন্দ ভালভাবে পরিষ্কার করে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। একে কিউরিং বলে। কিউরিং করে পরবর্তীতে প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতটি হেক্টর প্রতি ৩০-৩৩ টন ফলন দিতে পারে।

সংরক্ষণ

গর্ত খনন করে হলুদের কন্দ রাখলে সঠিক আর্দ্রতা ও সতেজতা বজায় থাকে। খড়ের চালাযুক্ত মেঝেতে ট্রেন্স তৈরি করে বালি দিয়ে তার উপর হলুদের কন্দ বিছিয়ে দিতে হবে। এরপর বিছিয়ে দেয়া কন্দের উপরে বালি দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দিতে হবে। অবশ্যই পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কমোডিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

জীবাণু সার

জীবাণু সার কি?

মাটিতে উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশকীয় মৌলিক উপাদানসমূহের অভাব ঘটলে কৃত্রিমভাবে তৈরি করে মৌলিক উপাদান প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফসলের পুষ্টি উপাদানসমূহের ঘাটতি পুরণে যে সব দ্রব্য প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে সার বলা হয়। জীবাণু যখন সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে জীবাণু সার বলা হয়। অন্য কথায় জীবাণু যখন মাটিতে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি মেটানোর নিমিত্ত ব্যবহার করা হয় তখন তাকে জীবাণু সার বলা হয়।

জীবাণুর বিস্তার প্রকৃতির সর্বত্র। মাটি, পানি ও বাতাসে কোন না কোনভাবে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে মৃত্তিকায় এদের সংখ্যা প্রচুর। আমাদের কৃষি জমিতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র জীবাণু পাওয়া যায়, যা গাছের খাদ্য সরবরাহ করে ফসল উৎপাদনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। ঐসব আণুবীক্ষনিক ক্ষুদ্র জীবাণুকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে মাটি বা ফসলের উপযোগী করে বাছাই করা হয় এবং বাছাইকৃত জীবাণুগুলোকে ল্যাবরেটরীতে বা কারখানায় বিশেষ পদ্ধতি অনুসরন করে জীবাণু সার তৈরি করা হয়। বিনা বিভিন্ন ফসলের ৯ টি জীবাণু সার উদ্ভাবন করেছে।

জীবাণু সারের প্রয়োজনীয়তা

জীবাণু সার প্রকৃতি থেকে পৃথকীকৃত জীবাণুদ্বারা উৎপাদিত হয় বলে পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, ফলে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে। সাধারণত: গাছের বৃদ্ধির জন্য ১৭ টি অত্যাবশকীয় খাদ্য উপাদান প্রয়োজন, যাদের মধ্যে নাইট্রোজেন অন্যতম। বায়ুমন্ডলের প্রায় ৭৭.১৬% নাইট্রোজেন থাকলেও উদ্ভিদ বা প্রাণী সাধারণত: ঐ বায়বীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। পরিমানমত নাইট্রোজেনের সরবরাহ পেলে গাছ ঘন সবুজ ও রসালো হয়। নাইট্রোজেনের অভাবে গাছ বেঁটে, হলুদ বর্ণের ও কম শিকড়যুক্ত হয় এবং বাহ্যিকভাবে অপুষ্টির লক্ষণ প্রদর্শন করে। পৃথিবীর প্রায় সকল মাটিতেই নাইট্রোজেনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের মাটিতে এর অভাব আরও প্রকট। মাটির এ ঘাটতি পূরণে ইউরিয়া বা অ্যামোনিয়াম সালফেট সার ব্যবহার করা হয়। শিল্প-কারখানায় সার দুটি তৈরি করতে প্রচুর শক্তি (২০০-৩০০ অ্যাটমোস্ফিয়ার), তাপমাত্রা (৪৫০-৫০০° সে.) এবং অর্থ ব্যয় হয়।

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ডাল একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। কিন্তু এই আমিষ সমৃদ্ধ, সুস্বাদু ও সুপাচ্য খাদ্যবস্তুটি খাদ্য তালিকা থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে কারণ চাহিদার তুলনায় আমাদের দেশে ডাল ফসলের উৎপাদন হেক্টর প্রতি বেশ কম। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে কিন্তু সে অনুপাতে চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানো যাচ্ছে না বরং কমছে। চাহিদার তুলনায় ডালের উৎপাদন কম বিধায় প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ ডাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। অতএব, ডালের উৎপাদন

বাড়ানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে হেক্টর প্রতি ফলন বাড়ানো। সেক্ষেত্রে আধুনিক চাষ পদ্ধতি, উচ্চ ফলনশীল জাত ও জীবাণু সরের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ডাল ও তৈল (সয়াবিন ও চীনাবাদাম) শস্যে ব্যবহৃত রাইজোবিয়াম/ব্রাডিরাইজোবিয়াম জীবাণু সার অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৫০-৩০০ কেজি নাইট্রোজেন বাতাস থেকে সংগ্রহ করতে সক্ষম। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ঋতুর প্রভাবে বাংলাদেশের মাটিতে বিদ্যমান রাইজোবিয়াম/ব্রাডিরাইজোবিয়াম জীবাণুর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কমে যায়। অতএব প্রত্যেক মৌসুমে ডাল ও তৈল জাতীয় ফসল চাষের সময় জীবাণু সার ব্যবহার করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ডাল ও তৈল জাতীয় শস্যে জীবাণু সার ব্যবহারের উজ্জল সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত জীবাণু সার (রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়া যা পিট মাটিতে মেশানো) কৃষকের মাঝে সরবরাহ করা হচ্ছে। জীবাণু সার ব্যবহারের ফলে ৯ টি ডাল ও শিম জাতীয় শস্যের (মসুর, ছোলা, মুগ, বরবটি, চীনাবাদাম, ধৈঞ্চা ইত্যাদির) শিকড়ে তুলনামূলকভাবে বেশি নাইট্রোজেন গুটি (নডিউল) তৈরি হয় এবং সয়াবিনে ৭৫-১৫০% এবং অন্যান্য ডাল ও শীম জাতীয় শস্যে ২০-৪৫% বেশি ফলন পাওয়া যায়।

নিম্নোক্ত জীবাণুসার বিনাতে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১. বিনা এলটি-১৮

মসুর চাষের জন্য রাইজোবিয়াম জীবাণুসারটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। জীবাণু সার প্রয়োগ করে মসুর বীজের উৎপাদন ১৫-৪০% বৃদ্ধি পায়।

২. বিনা সিপি-২

এ জীবাণুসারটি ছোলা চাষের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যা ছোলার উৎপাদন ১৫-৪০% বাড়াতে পারে।

৩. বিনা এমবি-১

এটি একটি ব্রাডিরাইজোবিয়াম ইনোকুল্যান্ট, যা মুগ ডাল চাষে ব্যবহার করা হয়। এটির ব্যবহারে মুগের ফলন ১৮-৩০% বাড়তে পারে।

৪. বিনা সিওপি-৭

বরবটি চাষের জন্য এই ইনোকুল্যান্টটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর ব্যবহারে ফসলের ফলন ১৮-৩০% বৃদ্ধি পায়।

৫. বিনা জিএন-২

এই জীবাণুসারটি চীনাবাদাম চাষের জন্য তৈরিকৃত ও সুপারিশকৃত। এর ব্যবহারে চীনাবাদামের ফলন ১৮-৩০% বৃদ্ধি লাভ করে।

৬. বিনা এসবি-৪

সয়াবিন চাষের জন্য শক্তিশালী ব্রাডিরাইজোবিয়াম ইনোকুল্যান্টটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। চাষীরা এ জীবাণু সার ব্যবহার করে সয়াবিনের ৭৫-১৫০% বেশি ফলন পেতে পারেন।

৭. বিনা বিজি-১

মাষকলাই চাষের জন্য জীবাণু সার উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এটি মাষকলাইয়ের ফলন ১৮-৩০% বৃদ্ধি করতে পারে।

৮. বিনা ডিসি-৯

জীবাণু সার তৈরি করা হয়েছে ধৈঞ্চা চাষের জন্য। এটির ব্যবহারে ফসলের বীজের ফলন ১৫-৪০% বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৯. বিনা জীবাণু সার-১০

এই জীবাণু সারটি তৈরি করা হয়েছে ডাল ফসল ফেলন চাষের জন্য। এ সার ব্যবহারে ফেলনের বীজের ফলন ১৫-২৫% এবং সবজি (সবুজ ফল) এর ফলন ১৪-২৪% বৃদ্ধি পায়। জীবাণু সার ব্যবহারের ফলে শস্যের গুণগতমান ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

জীবাণু সারের প্রয়োগমাত্রা

এ সারের পরিমান বিভিন্ন শস্যের জন্য বিভিন্ন রকম। মুগ, মসুর, মাষ, ধৈঞ্চা ইত্যদি ছোট আকারের বীজে প্রতি কেজিতে ৫০ গ্রাম এবং ছোলা, মটর, সয়াবিন, বরবটি, চীনাবাদাম ইত্যদি বড় আকারের বীজে প্রতি কেজিতে ৩০ গ্রাম জীবাণু সার নিয়ম অনুযায়ী মিশিয়ে বপন করতে হয়।

জীবাণু সার ব্যবহারে সতর্কতা

জীবাণু সার উৎপাদনের পর থেকে শুরু করে মাঠে ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত পিট মাটির ভিতর যেন নির্দিষ্ট সংখ্যায় জীবাণুগুলো জীবিত অবস্থায় থাকে। কারণ জীবিত জীবাণুগুলো পরবর্তী সময়ে নাইট্রোজেনের গুটি তৈরি করবে। জীবাণুগুলো কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা মারা গেলে এ সার ব্যবহারে ফসল বা মাটির কোন ক্ষতি না হলেও বাড়তি কোন লাভ আশা করা যায় না।

জীবাণু সার ব্যবহারের নিয়মাবলী

সুস্থ, সতেজ ও শুকনা বীজে পরিমাণমত চিটাগুড় মিশিয়ে নিতে হবে যাতে বীজগুলো আঠালো হয়। চিটাগুড়ের অভাবে ভাতের ঠান্ডা মাড় বা পানি ব্যবহার করা যায়।

- আঠালো বীজগুলোর সাথে জীবাণু সার ঢেলে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে প্রতিটি বীজের গায়ে একটি কালো প্রলেপ পড়ে।
- কালো প্রলেপযুক্ত বীজ ছায়ায় সামান্য শুকিয়ে নিতে হবে যাতে বীজগুলো গায়ে গায়ে লেগে না থাকে। বেশি শুকালে জীবাণু সারের কার্যকারিতা কমে যায়।
- জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ রৌদ্রহীন বা খুব অল্প রৌদ্রে বপণ করে বীজগুলো মাটি দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢেকে দিতে হবে।
- কীটনাশক মিশ্রিত বীজে জীবাণু সার ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়, তবে বীজগুলোকে ভালভাবে ধুয়ে ও রৌদ্রে শুকিয়ে জীবাণু সার ব্যবহার করা যায়।
- ঠান্ডা, শুষ্ক ও রোদমুক্ত জায়গায় জীবাণু সার ও জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ রাখতে হয়।
- জীবাণু সার উৎপাদনের ১৮০ দিনের মধ্যেই ব্যবহার করা উত্তম।

ফসফো-ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সার সাশ্রয়

ভূমিকা:

ফসফো-ভার্মিকম্পোস্ট বিভিন্ন জৈব পদার্থের সাথে রকফসফেট মিশ্রিত করে কেঁচো সহযোগে পচনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এতে বিদ্যমান ফসফরাস ধানসহ অনেক ফসলের সম্পুর্ণ ফসফরাস সারের চাহিদা মেটাতে পারবে যা মৃত্তিকার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং ফসফেটিক সারসহ অন্যান্য রাসায়নিক সার সাশ্রয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য:

দুই ভাগ গোবর, এক ভাগ কচুরীপানা ও এক ভাগ ধানের খড়ের (২:১:১ অনুপাতে) সহিত ৪% রকফসফেট গুঁড়া মিশিয়ে চারিতে ভরাট করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (প্রায় ১৫০টি কেঁচো/চারী) কেঁচো (*Eisenia foetida* বা রেড উইগলার) প্রয়োগ করে পচনের মাধ্যমে ফসফো-ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করা হয়েছে।

তৈরি পদ্ধতি সহজ। পরিবেশ বান্ধব, সাশ্রয়ী, কর্মসংস্থান সুযোগকারক এবং লাভজনক। কৃষক তার খামার জাত জৈব পদার্থ, কেঁচো ও রকফসফেট ব্যবহার করে ফসফো-ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করতে পারবে।

এতে ১৫.২% জৈব কার্বন, ১.৪২ N, ১.৪৫ P, ১.৫২% K ও ০.৩৫% S থাকে। তা ছাড়াও এতে বিভিন্ন উপকারী অনুজীব বিদ্যমান থাকে যেমন-ফসফেট দ্রবীভূতকারী ব্যাকটেরিয়া প্রতি গ্রামে ৮×১০^{৬} টি থাকে এবং টোটাল ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি গ্রামে ৭×১০^{১২} টি থাকে।

প্রযুক্তির উপযোগীতা:

- ফসফো-ভার্মিকম্পোস্ট ছাদবাগানে, উদ্যানতাত্বিক এবং মাঠ ফসলে ব্যবহার উপযোগী।
- ধানসহ অনেক ফসলের সম্পূর্ণ ফসফেট সারের চাহিদা মেটাতে পারে।

প্রযুক্তি থেকে উপকার:

- টিএসপি সারের পরিবর্তে ব্যবহার হয় বিধায় বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় হবে।
- এর প্রয়োগে ধানের ফলণ ১৪.৫% ও খড়ের ফলণ ১২.৭% বেশী হয় -ফলে প্রতি হেক্টরে ১৮,২১৩/ টাকা বেশী আয় হয়।
- বোরোধান আবাদে ২টন/হেক্টর ফসফো-ভার্মিকম্পোস্ট প্রয়োগে ১০০% টিএসপি, ২১% ইউরিয়া, ৪৪.৭% এমওপি ও ৫৭.৬% জিপসাম সার সাশ্রয় হয়।

নন-কমোডিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

১. প্রধান প্রধান শস্য পরিক্রমায় সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

ক. বোরো-সবুজ সার-রোপা আমন শস্য পরিক্রমা

প্রয়োগ স্থান: সেচের আওতাধীন ধান উৎপাদনের এলাকাসমূহ যেমন বৃহত্তর ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের কিছু অংশ।

বৈশিষ্ট্য: সুষম পুষ্টি উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে ধানের অব্যাহত উচ্চ ফলন অর্জন ও মৃত্তিকার পুষ্টিমান সংরক্ষণ। অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রযুক্তিটি লাভজনক এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সুষম পুষ্টি প্রয়োগে সার সুপারিশ ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর প্রতি)

শস্য পরিক্রমা	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরাক্স	সবুজ সার (ধৈঞ্চা)	ফলন
	কেজি						টন	টন
বোরো (উফশী)	৩১৫	১৭৫	১৩৪	১১০	১১	৯.৫	-	৭.০
সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	৫.৬	-
রোপা আমন (উফশী)	১১৫	৮৫	৬৮	৫৫	-	-	-	৫.৫

খ. গম-রোপা আউশ-রোপা আমন শস্য পরিক্রমা

প্রয়োগ স্থান: রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুর ও যশোর জেলাসমূহ।

বৈশিষ্ট্য: সমন্বিত ও সুষম পুষ্টি উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে ধানের অব্যাহত উচ্চ ফলন অর্জন ও মৃত্তিকার পুষ্টিমান সংরক্ষণ। অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রযুক্তিটি লাভজনক এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

সুষম পুষ্টি প্রয়োগে সার সুপারিশ ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর প্রতি)

শস্য পরিক্রমা	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরাক্স	সবুজ সার (ধৈঞ্চা)	ফলন
	কেজি						টন	টন
গম (উফশী)	২১৭	৮৫	১০০	১১০	১১	১৯	৫	৩.৮
রোপা আউশ	১৫২	৪৫	৩৪	৫৫	-	-	-	৪.৫
রোপা আমন (উফশী)	১৫২	৪৫	৩৪	৫৫	-	-	-	৫.২

বোরন Solubor বা বোরাক্স নামে বাজারে পাওয়া যায়, যার দাম কেজি প্রতি মাত্র ৬০ টাকা। পরিমাণে অত্যন্ত কম লাগে বিধায় এর ব্যবহার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক।

গ. সরিষা-বোরো-রোপা আমন শস্য পরিক্রমা

প্রয়োগ স্থান: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, যশোর, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলাসমূহ।

বৈশিষ্ট্য: সমন্বিত ও সুষম পুষ্টি প্রয়োগে শস্যের অব্যাহত উচ্চ ফলন অর্জন ও মৃত্তিকার পুষ্টিমান সংরক্ষণ। অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রযুক্তিটি লাভজনক এবং এটি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

সমন্বিত ও সুষম সার সুপারিশ ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর প্রতি)

শস্য পরিক্রমা	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরাক্স	সবুজ সার (ধৈঞ্চা)	ফলন
	কেজি						টন	টন
সরিষা (উফশী)	২৬০	১৭৫	১৩৪	১১০	১১	১৯	৫	১.৫
রোপা আউশ	২১৭	৮৫	৬৮	৫৫	-	-	-	৫.৮
রোপা আমন (উফশী)	১৭৪	৪৫	৩৪	৫৫	-	-	-	৫.৮

ঘ. সরিষা-বোরো-রোপা আমন শস্য পরিক্রমা

প্রয়োগ স্থান: কুমিল্লা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৯)

বৈশিষ্ট্য: সমন্বিত ও সুষম পুষ্টি উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে ফসলের উচ্চফলন অব্যাহত রাখা সম্ভব, এছাড়াও মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় থাকবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রযুক্তিটি লাভজনক।

সুষম পুষ্টি প্রয়োগে সার সুপারিশ ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর প্রতি)

শস্য পরিক্রমা	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরাক্স	সবুজ সার (ধৈঞ্চা)	ফলন
	কেজি						টন	টন
সরিষা	২১৭	১২৫	৬০	১১০	১২	৯.০	৫.০	১.৫-১.৮
বোরো	৩২৫	৬৫	৭০	৫৬	-	-	-	৬.০-৬.৫
রোপা আমন	২২৮	৪০	৪৬	৫৬	-	-	-	৪.৫-৫.০

ঙ. গম-ডাল ফসল-রোপা আমন শস্য পরিক্রমা

প্রয়োগ স্থান: দিনাজপুর (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১)

বৈশিষ্ট্য: সমন্বিত ও সুষম পুষ্টি উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে ফসলের উচ্চফলন অব্যাহত রাখা সম্ভব, এছাড়াও মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় থাকবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রযুক্তিটি লাভজনক।

সুষম পুষ্টি প্রয়োগে সার সুপারিশ ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর প্রতি)

শস্য পরিক্রমা	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	ম্যাগনেজিসাম	জৈব সার	ফলন
	কেজি						টন	টন
গম	২১৭	২১৭	১৭০	১৩৯	২২	১৮	গোবর সার ৫.০	৩.৫-৪.৫
মুগডাল	-	-	২৪	২৮	-	-	জীবাণু সার	১.২-১.৫
রোপা আমন	১৬৩	১৬৩	৭০	২৮	-	-	মুগবীন ফসলের অবশিষ্টাংশ	৪.০-৫.০

চ. ডাল ফসল-পাট- রোপা আমন শস্য পরিক্রমা

প্রয়োগ স্থান: মাগুরা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১)

বৈশিষ্ট্য: সমন্বিত ও সুষম পুষ্টি উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে ফসলের উচ্চফলন অব্যাহত রাখা সম্ভব, এছাড়াও মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় থাকবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রযুক্তিটি লাভজনক।

সুষম পুষ্টি প্রয়োগে সার সুপারিশ ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর প্রতি)

শস্য পরিক্রমা	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	মলিবডেনাম	জৈব সার	ফলন
	কেজি						টন	টন
মসুর	-	১২৫	৪৬	৮৩	৯	২	জীবাণু সার	৩.৫-৪.৫
পাট	১৮৪	৪০	৩০	৫	-	-	গোবর সার	১.২-১.৫
রোপা আমন	১৮৪	৮০	৬০	৫৬	-	-		৪.০-৫.০

২. ধান ভিত্তিক শস্য পরিক্রমায় ফসফেট সার ব্যবস্থাপনা

প্রয়োগের স্থান: ধান উৎপাদন করা হয় এমন সকল ভূমি।

বৈশিষ্ট্য: অব্যাহত শস্য উৎপাদনে ফসফেট সারের পরিমিত প্রয়োগের মাধ্যমে এর প্রয়োগ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও নির্দেশনা

(i) স্বল্প থেকে নিরপেক্ষ সকল জমিতে সুপারিশকৃত ফসফেট সার শস্য পরিক্রমায় শুধু রবি শস্যে প্রয়োগ করতে হবে এবং খরিফ শস্যে ধানের চাষ করা হলে কোন ফসফেট সার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না।

(ii) তবে অধিক অম্লীয় ও ক্ষারীয় জমিতে খরিফ শস্যে সুপারিশকৃত সারের অর্ধেক পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে।

৩. ধান চাষে নাইট্রোজেন সার ব্যবস্থাপনা

প্রয়োগ স্থান: ধান চাষের উপযোগী বাংলাদেশের সকল আর্দ্রভূমি।

বৈশিষ্ট্য

(i) নাইট্রোজেন সারের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি।

(ii) নাইট্রোজেন সারের অপচয় রোধ।
(iii) সমপরিমাণ ফলনের জন্য নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগ অর্ধেক পরিমাণ কমিয়ে আনা।
(iv) নাইট্রেট দ্বারা পরিবেশ দূষণ রোধ।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও নির্দেশনা

(i) বড় দানা ইউরিয়া মৃত্তিকার প্রায় ১০ সে.মি. গভীরে রোপণের ৮-১২ দিন পর একবারে প্রয়োগ করতে হবে।
(ii) উপরের পদ্ধতি সম্ভব না হলে ধানের জমিতে তিন কিস্তিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি শেষ চাষের আগেই নিষ্কাশিত কর্দমাক্ত জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি দ্রুত কুশি বেরোনের সময় ও কাঁচা থোর বের হওয়ার (পি আই) সময়ে নিষ্কাশিত জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তি প্রয়োগের সময় সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে ১/২ দিন পর সেচ দিতে হবে।

৪. পটাশ সার ব্যবস্থাপনা

ক. প্রয়োগ স্থান: ময়মনসিংহ (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৯) এবং বগুড়া (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৫)।

বৈশিষ্ট্য: বোরো এবং আমন ধান চাষে বিভিন্ন মাত্রার পটাশ সার প্রয়োগ করে Crop response curve থেকে দেখা যায় যে, ময়মনসিংহ (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৯) এ বোরো এবং আমন ফসলে পটাশের কাম্য মাত্রা Optimum dose হল ৫৩ ও ৪৪ কেজি/হেক্টর। অন্যদিকে বগুড়া (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৫) এ এর কাম্য মাত্রা (Optimum dose) হল যথাক্রমে ৬৫ ও ৫৪ কেজি/হেক্টর।

খ. প্রয়োগ স্থান: কাউনিয়া, রংপুর (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩)।

বৈশিষ্ট্য: আলু ফসলে ৯৬ কেজি/হেক্টর পটাশ সার ব্যবহারে সর্বোচ্চ ফলন অর্জন সম্ভব, যাতে কৃষকের ব্যবহৃত পটাশ সারের মাত্রা থেকে ৩০% কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এতে উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

৫. সালফার ও জিংক সার ব্যবস্থাপনা

প্রয়োগ স্থান: রংপুর (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩)

বৈশিষ্ট্য: আলু বোরো আমন শস্যবিন্যাসের প্রথম ফসলে ১০০% সালফার ও জিংক সার ব্যবহার করলে পরবর্তী ফসলগুলিতে অনুমোদিত মাত্রা Recommended dose এর ৫০% সালফার ব্যবহার করলেই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

৬. নাইট্রোজেন সার মাত্রা

প্রয়োগ স্থান : ঈশ্বরদী (উঁচু ও মাঝারি উঁচু এলাকা; কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১)

প্রয়োগ পদ্ধতি ও নির্দেশনা: দু'টি দানা জাতীয় ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে/মাঝখানে একটি মুগ ফসল চাষ করে ফসলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আমন ফসলে নাইট্রোজেন সারের অনুমোদিত মাত্রার (Recommended dose) এক তৃতীয়াংশ প্রয়োগ কমিয়ে আনা সম্ভব।

৭. ফসফেটিক জীবাণু সার

প্রয়োগ স্থান: ময়মনসিংহ, পাবনা ও রাজশাহী।

বৈশিষ্ট্য: গম ফসলে ফসফেটিক জীবাণুসার এর প্রভাব পাবনা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহের অন-ফার্ম মাঠ পরীক্ষায় জানা গেছে যে, সুপারিশকৃত অর্ধমাত্রা টিএসপির সাথে ফসফরাস দ্রবীভূতকারী জীবাণু (১.৫ কেজি/হেক্টর) প্রয়োগ করলে পুরোমাত্রা টিএসপির সমতুল্য ফলন পাওয়া যায়। বীজের সাথে ফসফেটিক জীবাণুসার ব্যবহার করতে হয়। ফসফেটিক জীবাণুসার ব্যবহারে টিএসপির পরিমাণ অর্ধেক কম লাগায় কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং সারটি পরিবেশ বান্ধব।

সেচ সুবিধার অভাবে যেখানে রবি মৌসুমে জমি পতিত থাকে এবং রোপা আমন ধান দেরিতে কাটার ফলে পরবর্তী ফসলের জন্য জমি তৈরি সম্ভব হয় না, সেখানে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে হেক্টর প্রতি ২-৩ টন গম উৎপাদন সম্ভব।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও নির্দেশমালা: রোপা আমন ধান কাটার এক সপ্তাহ আগেই ধানের ভিজাতে গমের অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেনসহ সুপারিশকৃত সার প্রয়োগ করতে হবে। ধান কাটার সাথে সাথেই দেশী লাংগল দিয়ে ধানের দু'টি সারির মাঝখানে ৫ সে.মি. গভীরে লাইন টেনে গম বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে হবে। ৪০-৪৫ দিন পরে বাকি অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনমত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গম পাকার সাথে সাথে কাটতে হবে।

৮. লবণাক্ত জমিতে গম চাষ

প্রয়োগ স্থান: সাতক্ষীরা ও একই রকম অঞ্চলের লবণাক্ত জমি।

বৈশিষ্ট্য: শুকনো শীতকালীন মৌসুমে সমুদ্র তীরবর্তী বিশাল এলাকায় লবণাক্ততার কারণে কোন ফসল হয় না। কিন্তু গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ঐ ধরণের এলাকায় রোপা আমন ধান কাটার পর পরই জমিতে জো আসার সাথে সাথে জমি তৈরি করে কাঞ্চন বা আকবর জাতীয় গমবীজ বুনে দিতে হবে। এই অঞ্চলের উপরিভাগের মাটি অতি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে পানি শূন্য হয়ে যায়। তাই জমি মোটামুটি আর্দ্র থাকা অবস্থায় গম বীজ গজানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বীজের শিকড় মাটির একটু গভীরে প্রবেশ করলে গম চারার বৃদ্ধিতে আর অসুবিধা হবে না। পরবর্তীতে নিকটবর্তী যে কোন উৎস হতে দু-একবার পানি সেচ দিতে হবে। স্বাভাবিক নিয়মেই নিড়ানি দিতে হবে। গম পাকার সাথে সাথে কাটতে হবে।

লাভ-খরচ: লবণাক্ত জমিতে শীতকালীন ফসল উৎপাদন তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল হলেও জমি পতিত না রেখে উপরোক্ত পদ্ধতিতে গম চাষ লাভজনক হবে। এতে লবণাক্ত এলাকায় চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে এবং লবণাক্ত জমির জৈবিক উন্নতি হবে।

৯. মাটিতে দস্তার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়

বাংলাদেশের মাটিতে দস্তা সারের অভাব সর্বপ্রথম এই ইনস্টিটিউট থেকেই শনাক্ত করা হয় এবং জিংক ৬৫ রেডিও আইসোটোপ ব্যবহারের মাধ্যমে দস্তা ঘাটতি এলাকায়, বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল ধানের জমিতে প্রতি হেক্টরে ৫ কেজি দস্তা প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়, যা এখন আংশিক সংশোধিত আকারে সারা দেশে প্রচলিত। এই ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ১৯৮৯ সনের জাতীয় সার প্রয়োগের সুপারিশমালা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে, যা আঞ্চলিক ও জেলা কারিগরি কমিটির প্রশিক্ষণ কাজে

ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও থানা সার প্রয়োগ নির্দেশিকা তৈরিতেও ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. আইল ব্যবস্থাপনা ও সম্পুরক সেচের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে আউশ ও আমন ধান চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য:

জমির চতুর্দিকে ২০ সে.মি. উচু আইল তৈরি করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে খরার প্রভাব কমানো যায়।

আমন ধানে ১ টি এবং আউশ ধানে ২-৩ টি সম্পুরক সেচের মাধ্যমে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

প্রযুক্তির থেকে লাভ: আমন ধানে ১০-১৫% অধিক ফলন পাওয়া যায়।

আইলের মাধ্যমে আউশ ধানে ৩৫-৩৮% সেচের পানি সাশ্রয় হয়।

উপযোগী এলাকা: নাচোল ও চাপাইনবাবগঞ্জ। অন্যান্য অঞ্চলে আউশ ও আমন ধান চাষে সমভাবে প্রযোজ্য।

১১. লাভজনক এবং পানি সাশ্রয়ী শস্য বিন্যাস (ময়মনসিংহ)

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও লাভ:

"রোপা আমন (বিনাধান-৭)- সরিষা (বিনাসরিষা-৮)- বোরো" শস্যবিন্যাস থেকে কৃষকের শস্যবিন্যাস "রোপা আমন-পতিত-বোরো" অপেক্ষা ৩৭% অধিক ফলন পাওয়া যায় এবং ৫% পানি সাশ্রয় হয়।

রোপা আমন: ২টি পরিপূরক সেচ
সরিষা: ১টি সেচ (৩-৪ সে.মি.) ২০-২৫ দিন পার

বোরো ধান: এ. ডাবলু. ডি. (পাঁচ দিন পর), অর্থাৎ সেচকৃত পানি (৫ সে.মি.) অদৃশ্য হওয়ার ৫ দিন পর সেচ।

উপযোগী এলাকা:
ময়মনসিংহ (ফুলপুর, তারাকান্দা)

১২. উফশী সরিষাজাত সফল ও অগ্রণীর জন্য সেচ অনুসূচি

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর ৩ সে.মি. পরিমাণের একটি সেচ এবং জামালপুর ও ঈশ্বরদী অঞ্চলে বীজ বপনের পর দু'টি সেচ (প্রতিটি ৪-৫ সে.মি. পরিমাণের), প্রথমটি ২৫-৩০ দিনে এবং দ্বিতীয়টি ৬৫-৭০ দিনে প্রদান করে উচ্চ ফলনশীল সফল ও অগ্রণীজাতের সরিষা বীজের ফলন ২০-৩০% বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১৩. স্বল্প সেচে শস্য বিন্যাস-১ (বরেন্দ্র অঞ্চলে)

রোপা-আমন (জাত: বিনাধান-৭) - রবি (জাত: গম/সরিষা/ছোলা)- খরিফ-১ (জাত: মুগ/তিল)
প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতার নিরীক্ষে স্বল্প সেচে রোপা-আমন ভিত্তিক একটি শস্য পরিক্রমা উদ্ভাবন করা হয়েছে। সর্বাধিক লাভজনক শস্য পরিক্রমা বিনাধান-৭-বিনাছোলা-৪-বিনামুগ-৫।

সেচের পানির অপ্রতুলতার জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলের অনেক জমিতে শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না ফলে তা পতিত থাকে। তাই আমন মৌসুমে স্বল্প জীবন কালীন বিনাধান-৭ এর চাষ ও তা অগ্রিম কর্তন করে সেই জমিতে সঞ্চিত মৃত্তিকা রস বা সামান্য বাড়তি সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে

স্বল্প পানির চাহিদাযুক্ত গম/ডাল/তৈল জাতীয় শস্যের চাষাবাদ করার নতুন শস্য পরিক্রমা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর ফলে বরেন্দ্র এলাকার অনেক অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব। শস্যবিন্যাসে বিভিন্ন শস্যের সেচসূচী নিম্নরূপ:

বিনাধান-৭ : সেচ বিহীন

গম : ৩ টি সেচ (বপনের ২০-২৫, ৪০-৪৫ এবং ৬০-৬৫ দিন পর)

সরিষা : ২টি সেচ (বপনের ২০-২৫ এবং ৪০-৪৫ দিন পর)

ছোলা : ১টি সেচ (বপনের ২০-২৫ দিন পর)

মুগ/তিল : ১টি সেচ (বপনের ২৫-৩০ দিন পর)

ফলন/প্রাপ্তি: বছরে ৩ টি শস্যের চাষাবাদ হবে, স্বল্প সেচ পানি ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন সীমিত হবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

ফলন: বিনাধান-৭: ৪.৪ - ৫.৫ টন/হে., গম: ৩.৬৭ - ৪.০ টন/হে., সরিষা: ২.০ - ২.৪ টন/হে., ছোলা: ১.৩ - ১.৬ টন/হে., মুগ: ১.২৮ -১.৩০ টন/হে., তিল: ১.৫১ - ১.৫৩ টন/হে.।

উপযোগী অঞ্চল: রাজশাহীর তানোর, গোদাগাড়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল, গোমস্তাপুর, মহনপুর; এবং অনুরূপ এলাকা।

১৪. পানি সাশ্রয়ী শস্য বিন্যাস-২ (মাগুরা)

রোপা আমন (জাত: বিনাধান-৭) - মসুর (জাত: বিনামুসুর-৪)- তিল (জাত: বিনাতিল-২)

বৈশিষ্ট্য: পানি সাশ্রয়ী শস্য বিন্যাস
রোপা আমন: ২টি সম্পূরক সেচ
মসুর: ১টি সেচ (৩ সে.মি.) ৩০ দিন পর
তিল: ১টি সেচ ২৫ দিন পর

উপযোগী অঞ্চল: মাগুরা সদর

ফলন/প্রাপ্তি: কৃষক কর্তৃক চাষাবাদকৃত শস্যবিন্যাস "রোপা আমন-পতিত-বোরো ধান" অপেক্ষা ৯২% অধিক ফলন (ধান সমতুল্য ফলন) পাওয়া যায় এবং ৪৪% পানি সাশ্রয় হয়।

১৫. লবণাক্ত এলাকায় সূর্যমুখী, ভূট্টা এবং সয়াবীন চাষে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে প্রায় ৪ হতে ৭ ডিএস/মিটার (dS/m) মাত্রার লবণাক্ত মাটিতে ৪ হতে ৫ ডিএস/মিটার মাত্রার পানি দ্বারা সেচ প্রয়োগ।

উপযোগী অঞ্চল: সাতক্ষীরাসহ উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত জমি

ফলন/প্রাপ্তি: ধান চাষের পাশাপাশি সূর্যমুখী, ভূট্টা এবং সয়াবীন এর চাষ করা হলে অনেক লবণাক্ত জমি চাষের আওতায় আসবে। এর ফলে উক্ত অঞ্চলে কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে। সূর্যমুখী, ভূট্টা ও সয়াবীন চাষের ক্ষেত্রে মুনাফা ও খরচের অনুপাত যথাক্রমে ১.৭৮, ২.৩৩ ও ১.৬০।

১৬. লবণাক্ত এলাকায় রবিশস্য চাষের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে পুকুর ও জমির অনুপাত

বৈশিষ্ট্য: পুকুর (২ মিটার গভীর) ও জমির অনুপাত ১:২০ হলে, রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে একটি সেচ দিয়ে সরিষা ও তিল আবাদ করা সম্ভব।

উপযোগী অঞ্চল: উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা

ফলন/প্রাপ্তি: রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে বাড়তি ২ টি ফসল (সরিষা ও তিল) আবাদ করা সম্ভব।

১৭. লবণাক্ত এলাকায় গম চাষে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

বৈশিষ্ট্য:

ক. ৭-৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ত পানি ও পুকুরের (বৃষ্টির জমাকৃত) পানির পর্যায়ক্রমিক সেচ এবং সুপারিশকৃত মাত্রার ৯০% অতিরিক্ত জিপসাম সার প্রয়োগের মাধ্যমে গমের ফলন ৩.৫-৪.০ টন/হেক্টর পাওয়া গিয়েছে।

খ. ১০-১২ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ত পানির ৩টি সেচ এবং সুপারিশকৃত মাত্রার ৯০% অতিরিক্ত জিপসাম সার প্রয়োগের মাধ্যমে গমের ফলন ২.৫-৩.০ টন/হেক্টর পাওয়া গিয়েছে।

উপযোগী অঞ্চল: সাতক্ষীরা অঞ্চলের লবণাক্ত জমি।

ফলন/প্রাপ্তি: সাতক্ষীরা অঞ্চলের লবণাক্ত পতিত জমিতে গম চাষ করে সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যায়।

১৮. বরেন্দ্র অঞ্চলে রবি ও খরিফ শস্যের জন্য সেচ এবং মাটির আর্দ্রতা ব্যবস্থাপনা।

বৈশিষ্ট্য:

রবি মৌসুম: স্বল্প পানির চাহিদাযুক্ত রবি শস্যে ২টি সেচ (ভেজিটেটিভ ধাপে ও ফুল আসার সময়) অথবা মালচিং ও ১টি সেচ প্রয়োগে সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যায়।

খরিফ মৌসুম: বিনামুগ-৫ বপনের পূর্বে বা পরে ১টি সেচ এবং পরবর্তীতে ফুল আসার সময়ে ১টি সেচ প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

উপযোগী অঞ্চল: রাজশাহী অঞ্চল।

১৯. ধান চাষে স্বল্প পানি

ধান চাষে দেখা গেছে পর্যায়ক্রমে (Alternate) পানি ভর্তি করে পানি চুয়ে যাওয়ার ৫-৭ দিন পর্যন্ত শুকানোর পর পুনরায় পানি ভর্তি করলে সব সময় ধান ক্ষেতে পানি রাখার তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ পানি খরচ বাঁচানো যায় এবং ধানের ফসলের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ কোন ঘাটতি দেখা যায় না।

২০. সেচ নালা প্রযুক্তি

ক. প্রিকাস্ট সেচ নালা- এটি পাকা সেচ নালা। ফেরোসিমেন্ট সেচ নালা এক মিটার দৈর্ঘ্য টুকরা হিসেবে করা হয় এবং যে কোন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তর করা যায়। ফেরোসিমেন্ট সেচ নালা করতে ছোট ইটের টুকরা, বালু, সিমেন্ট ও তারের জালি প্রয়োজন হয়। এক মিটার দীর্ঘ ফেরোসিমেন্ট সেচ নালা তৈরি করতে একই দৈর্ঘ্যের ইটের পাকা সেচ নালার খরচের অর্ধেক খরচ হয়।

২১. পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকার জন্য নূতন শস্য পরিক্রমা

বরেন্দ্র এলাকায় খরিফ-২ মৌসুমে শুধুমাত্র বৃষ্টিপাত নির্ভরশীল আমন ধানের চাষ সাধারণতঃ কৃষকেরা করে থাকে। বাকি দুটি মৌসুমে পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা না থাকায় অথবা সেচ ব্যবস্থা ব্যয় বহুল হওয়ার

কারণে বেশির ভাগ জমি অনাবাদি থাকে। খরিফ-২ মৌসুমে স্বল্প সময়ের বা আগাম আমন ধান (বিনাধান-৪) চাষে মাটিতে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে আগাম ধান কর্তনের পর রবি মৌসুমে দানা জাতীয় ফসল গম বা ছোলা (হাইপ্রোছোলা/বিনাছোলা-৪) বরেন্দ্র এলাকায় উৎপাদন করা যায়। গম বা ছোলা কর্তনের পর শুধুমাত্র চারা গজানোর জন্য বুনন পূর্বে (Pre-sowing) একটি মাত্র সেচ প্রদান করে খরা সহিষ্ণু বিনামুগ-৫ উৎপাদন করা যায়।

২২. আর্সেনিকমুক্ত পানি উত্তোলনের জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন

ময়মনসিংহ জেলার সদর থানার অধীনে দাপুনিয়া ইউনিয়নের গোষ্টা উত্তর পাড়া গ্রামে বেশ কয়েকটি অগভীর নলকূপের খাবার পানিতে গ্রহণযোগ্য আর্সেনিক মাত্রার পরিমাণ বেশি হওয়ার পর আর্সেনিকমুক্ত অগভীর নলকূপ স্থাপনের গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হয়। অগভীর নলকূপ বসানোর জন্য বোরিং করার সময় স্তর ভিত্তিক ভূ-গর্ভস্থ মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহ করে আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং পানিতে আর্সেনিক উৎসের স্তর চিহ্নিত করার মাধমে সেই স্তর ভেদ করে ২৫০-২৭০ ফিট গভীরতায় বালি মাটির স্তর শনাক্ত করে অগভীর তারা নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখিত আর্সেনিকমুক্ত অগভীর নলকূপটি বসাতে মৃত্তিকা ও পানি বিশ্লেষণ খরচ বাদে সর্বমোট টাকা ৮৪৭৫/- মাত্র খরচ হয়েছে। উল্লিখিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আর্সেনিক সমস্যা কবলিত এলাকায় অগভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

২৩. পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লবণাক্ত এলাকার নতুন শস্য পরিক্রমা

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় খরিফ-২ মৌসুমে কৃষকেরা শুধুমাত্র বৃষ্টিপাত নির্ভরশীল আমন ধানের আবাদ করে থাকে। বাকি দুটি মৌসুমে আবাদি জমি লবণাক্ততার কারণে অনাবাদি থাকে। উক্ত এলাকায় রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে যখন মাটিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়ে সে সময়ে মাটিতে লবণাক্ততা দূরীকরণের জন্য ফসলের সেচের চাহিদার অতিরিক্ত নির্দিষ্ট মাত্রার স্বাদু বা মৃদু লবণাক্ত পানি প্রয়োগ করে (Leaching এর মাধ্যমে) মাটির লবণাক্ততা কমিয়ে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে বাড়তি দুটি ফসল উৎপাদন করা যায়।

লাভ-খরচ: জমি পতিত না রেখে কম বা বিনা কর্ষণে গম চাষ অবশ্যই একটি লাভজনক প্রযুক্তি। স্বাভাবিক পদ্ধতির তুলনায় এই প্রযুক্তির খরচ অত্যন্ত কম এবং উল্লেখযোগ্য ফলনসহ শস্যের নিবিড়তাও বৃদ্ধি পাবে।

২৪. বিনাশাইল ধান চাষে পরিপূরক সেচ

ময়মনসিংহ এবং জামালপুর এলাকায় আমন মৌসুমে বিনাশাইল চাষে কোন পরিপূরক (বৃষ্টিপাতের অতিরিক্ত) সেচ প্রয়োজন হয় না। রংপুর এবং ঈশ্বরদী এলাকায় বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে একটি সেচের প্রয়োজন হতে পারে।

২৫. ধানের জমিতে নাইট্রেড লিচিং (চুয়ানো)

পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রতিয়মান হয়েছে যে, ধানের জমিতে অনবরত পানি ধরে রাখলে বেশি নাইট্রেড নিচের দিকে চুয়ে যায়। অন্যদিকে, পর্যায়ক্রমে পানি ভর্তি ও পানি শুকিয়ে যাওয়ায় ৩-৫ দিন পর পুনরায় সেচ দিলে কম নাইট্রেড চুয়ায়।

২৬. ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থা

ময়মনসিংহ জেলা: ময়মনসিংহ জেলার অধিকাংশ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে এবং শুকনো মৌসুমে তা স্যালো টিউবওয়েল (STW) এর পাম্পক্ষমতার সীমার নিচে (>৭ মি.) নেমে যাচ্ছে।

দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা: পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় পানিস্তর স্যালো টিউবওয়েলের পাম্পক্ষমতার সীমার মধ্যে রয়েছে এবং এসব অঞ্চলে স্যালো টিউবওয়েল ব্যবহারের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু দিনাজপুর জেলার অনেক উপজেলায় পানিস্তর স্যালো টিউটওয়েল এর সীমার নিচে নেমে যায়, অধিকন্তু বর্ষা মৌসুম শেষে তা প্রায় পুনর্ভরাট হয়ে যায়।

রাজশাহী অঞ্চল: রাজশাহী জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরের দীর্ঘমেয়াদি তথ্য বিশ্লেষণ ও মডেল স্টাডি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ নলকূপের পানিস্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। মডেল পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান উত্তোলনের ধারা অব্যাহত থাকলে কিছু নলকূপের (যেমনঃ পবা, দূর্গাপুর, গোদাগারি ও মোহনপুর উপজেলার) পানিস্তর ২০৩০ সালে মধ্যে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ গভীরতায় এবং প্রায় সকল নলকূপের পানিস্তর ২০৫০ সালের মধ্যে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ গভীরতায় নেমে যাবে। পানি উত্তোলনের এ অবস্থা চলতে থাকলে তা পরিবেশ ও Sustainable food production- এর ক্ষেত্রে হুমকি স্বরূপ হবে।

ঢাকা শহর: ঢাকা শহরে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে (১৯৮৮ থেকে ২০০৪ সালের তথ্যানুযায়ী)। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে মিরপুর এলাকায়, যেখানে উল্লেখিত ১৭ বৎসরে নিম্নগামী হয়েছে ৪৬ মিটার (১৯৮৮ সালে ১৪.২ মিটার থেকে ২০০৪ সালে ৬০.৫ মিটার)।

২৭. ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর পরিমাপের যন্ত্র উদ্ভাবন

স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর পরিমাপের একটি যন্ত্র (Water Level Indicator) তৈরী করা হয়েছে, যার খরচ (২০০৩ সালের হিসাব) মাত্র ১,০০০ টাকা; যেখানে অনুরূপ কাজের জন্য বিদেশী যন্ত্রের দাম ২৫,০০০-৩৫,০০০ টাকা।

২৮. ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ

সাতক্ষীরা ছাড়া বিনা'র অন্যান্য উপকেন্দ্রে (ঈশ্বরদী, রংপুর, মাগুরা, কুমিল্লা) এবং টাঙ্গাইল এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে (<৩ dS/m) রয়েছে। ভরা সেচ মৌসুমে সাতক্ষীরায় পুকুর ও নদীর পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে। সকল এলাকার পানির পিএইচ (pH, এসিড/ক্ষারীয় সূচক) অনুমোদিত সীমার মধ্যে (<৮) রয়েছে। ঈশ্বরদী এলাকায় বাইকার্বনেটের (HCO_3^-) মাত্রা অনুমোদিত সীমার নিচে (<৮.৫ মি.গ্রা./লি) রয়েছে। সাতক্ষীরা ছাড়া সকল এলাকায় কোরাইড (Cl^-) এর মাত্রা অনুমোদিত সীমার (৫ মি.গ্রা/লি) অনেক নিচে নেমেছে। পানির গুণাগুণের সূচকগুলো সেচ শুরুর সময় (অক্টোবর-নভেম্বর) থেকে ভরা সেচের মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) ও সেচের মৌসুম শেষে (মে-জুন) ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২৯. ধানগাছ কর্তৃক আর্সেনিক শোষণ এবং মাটি-উদ্ভিদে আর্সেনিকের স্থানান্তর

পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ধান গাছ আর্সেনিকযুক্ত মাটি বা সেচের পানি থেকে আর্সেনিক শোষণ করে। গাছের মূল, কান্ড এবং শস্য দানায় আর্সেনিকের সঞ্চয়ের পরিমাণ বিভিন্ন মাত্রায় হয়। সবচেয়ে বেশি মাত্রায় হয় মূলে, তারপর শস্য দানায়। ইরাটম-২৪ ও ব্রিধান-২৮ নিয়ে পরীক্ষায় দেখা

যায়, ইরাটম-২৪ এ আর্সেনিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ০-০.১৪ মি.গ্রা/কেজি এবং ব্রিধান-২৮ এ আর্সেনিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ০-০.০৭ মি.গ্রা/কেজি। তাছাড়া দেখা যায় যে, প্রত্যেক জাতের ক্ষেত্রে আর্সেনিকের প্রভাবে ধান গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফলন কম হয়।

৩০. জলবায়ুর পরিবর্তন

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের (রাজশাহী, মাগুরা, ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা, পাবনা, ঈশ্বরদী, রংপুর, ঢাকা এবং কুমিল্লা) দীর্ঘমেয়াদী (১৯৭৬-২০০৮) আবহওয়ার বিভিন্ন উপাদানসমূহের (বৃষ্টিপাত, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, উজ্জ্বল সূর্যালোক ঘন্টা এবং বাতাসের বেগ) পরিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনের মাত্রা/হার অঞ্চল ভেদে ভিন্নতর দেখা যায়।

৩১. পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

ধানের কতকগুলো মিউট্যান্ট/জাত ধানের বাদামি গাছ ফড়িং এর বিরুদ্ধে পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ৮টি মিউট্যান্ট/জাত মাঝারি মানের প্রতিরোধক (Moderately resistant) বলে শনাক্ত করা হয়।

গামা রশ্মি ২৪০ গ্রে মাত্রায় প্রয়োগ করা হলে প্রয়োগের ৬ দিন পর লাল শুসরি পোকা (Red flower beetle) ১০০% মারা যায় এবং ৩ দিন পর ১০০% শুককীট মারা যায়।

সরিষার জাব পোকার বিরুদ্ধে তিনটি কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। মেটাসিসটক্স-জ ১৫ইসি ০.০৫% মাত্রায় পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগে সবচেয়ে কার্যকর এবং পরভোজী পতঙ্গের জন্য নিরাপদ হিসেবে প্রমাণিত হয়। তবে ডাইমেথিয়ন ৪০ ইসি পরভোজী পতঙ্গের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ হিসেবে প্রমাণিত।

পাটের বিছাপোকা, পাটের চেলে পোকা এবং পাটের ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের ওপর পাঁচটি কীটনাশকের প্রভাব পরীক্ষা করা হয়। লাভ-খরচের অনুপাত হিসাব করে দেখা যায় সে, রিপকর্ড সবচেয়ে কার্যকর এবং আর্থিক দিয়ে লাভজনক।

নিম এবং নিশিন্দা পাতার গুঁড়া (Powder) প্রয়োগ করে গুদাম ঘরে ডালের পোকা দমন করা যায়। গুদামজাত ডালে সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, নারিকেল তেল এবং নিম তেল প্রয়োগ করা হলে প্রয়োগকৃত ডালে ডালের পোকা খুব কম ডিম পাড়ে এবং এসব ডিম হতে পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হয় না বা ১০০% বন্ধ্যা হয়ে যায়।

৩২. সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় টমেটোর ঢলে পড়া রোগ দমন

সতেজ বীজ, চীনা বাদামের খৈল, ট্রাইকোডারমা ভিরিডি এবং ব্যাভিস্টিন (Bavistin 50 wp) প্রয়োগে টমেটোর ফিউজারিয়াম জনিত ঢলে পড়া রোগ দমন ব্যবস্থাপনা।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও নির্দেশনা: পুষ্ট, চকচকে রং এর অভাঙ্গা বীজ বেছে বীজতলায় বপন করতে হবে। বীজ যাতে পোকায়/পিঁপড়ায় খেতে না পারে সেজন্য বীজতলার চারপাশ দিয়ে সেভিন ডাস্ট ছড়িয়ে দিতে হবে। চীনাবাদামের খৈল (১৫ কেজি/হেক্টর) পানিতে মিশিয়ে তিন দিন রাখার পর পেস্ট আকারে প্রয়োগ করে চূড়ান্ত চাষ দিয়ে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। খৈল প্রয়োগের ১০ দিন পর জমিতে টমেটোর চারা লাগাতে হবে। যব বা গমের ভূষিতে জন্মানো ৫-৭ দিন বয়সের ট্রাইকোডারমা

ভিরিডি ৪০ গ্রাম/চারা হারে চারা লাগানোর সময় অথবা চারা লাগানোর ১০ দিনের মধ্যে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এক লিটার পরিষ্কার পানিতে ৪ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ২০০ মিলি হারে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি দেয়ার ৫ দিনের মধ্যে ১ম বার এবং ১২-১৫ দিনের মধ্যে ২য় বার প্রয়োগ করতে হবে।

উপকারিতা

১. জমিতে চারার সংখ্যা কমে যায় না।
২. চাষকৃত জমিতে খৈল ব্যবহারের জন্য মাটিতে উৎপাদনশীলতা মতা বৃদ্ধি পায়।
৩. মাটির উপকারী অণুজীবের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
৪. কৃষক আশানুরূপ ফলন পান।
৫. কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন।
৬. মাটির টিল্ট ও পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন মতা বৃদ্ধি পায়।

রোগ দমন ও ফলন বৃদ্ধি: টমেটোর চারা নভেম্বর মাসে রোপণ করে এ প্রযুক্তিতে ফিউজারিয়াম জনিত ঢলে পড়া রোগ দমন করে টমেটোর ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৩৩. আমন মৌসুমে স্থানীয় জাত চাষের কারণ

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গৌরীপুর উপজেলায় আমন মৌসুমে স্থানীয় জাত শতকরা ৫৩ ভাগ চাষ করার যে কারণসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

১. সামান্য নিচু জমি এবং পানি নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এ কারণে উফশী জাতের ধান চাষ করা যায় না।
২. কিছু এলাকায় উঁচু জমি হওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় পানির অভাবে উফশী জাত ভাল হয় না।
৩. বন্যা বা অন্য কোন কারণে নাবি রোপা করতে হয়। তখন উফশী জাত চাষ করা সম্ভব হয় না।
৪. কিছু এলাকায় বালু ও নিম্ন মানের মাটি থাকার কারণে উচ্চ ফলনশীল ধান ভাল হয় না।
৫. স্থানীয় জাত চাষে খরচ কম হওয়া।
৬. স্থানীয় জাতের ভাত খেতে সুস্বাদু। তাই অনেকে স্থানীয় জাত চাষ করে।
৭. গভীর পানিতে উচ্চ ফলনশীল জাত চাষ করা যায় না।
৮. দেশী জাতের ধানে বেশি খড় পাওয়া যায়।
৯. কিছু স্থানীয় জাত আগাম পাকে এ কারণে তা চাষ করা হয়। উল্লিখিত সমস্যার আলোকে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করলে উফশী জাতের চাষাবাদ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে এই এলাকায় ধানের ফলন বৃদ্ধি পাবে।

৩৪. উন্নত আমন ধান চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সফলতা নির্ণায়ক উপাদান

১. প্রযুক্তির কৃষি পরিবেশ-অঞ্চলের খাপ খাওয়ানোর সমতা
২. প্রযুক্তির লাভজনক হওয়ার মতা
৩. চাষীর ঋণ প্রাপ্যতা
৪. চাষী কর্তৃক প্রিন্ট মিডিয়া ব্যবহারের হার
৫. চাষীদের সম্প্রসারণ কর্মীর প্রতি আস্থা
৬. চাষী কর্তৃক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের হার এবং
৭. চাষী পরিবারের লোকসংখ্যা।

উক্ত তথ্যের আলোকে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে দেশে ধানের ফলন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

৩৫. কতিপয় ফসলের রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা

শীতকালীন মুগ, ছোলা ও সরিষার রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের জন্য এবং বিনামুগ-১ এর রোগ নিয়ন্ত্রণকল্পে ঈশ্বরদী অঞ্চলের জন্য এই ফসলগুলির বীজ বপনকাল নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে বপনকাজ সম্পন্ন হলে নির্দিষ্ট কয়েকটি রোগের হাত থেকে ঐ ফসলগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব।

ফসল	যে রোগের তীব্রতা কমায়	বপনের তারিখ	অঞ্চল
শীতকালীন মুগ (বিনামুগ-১)	সার্কোস্পোরা লিফস্পট	১০-১৫ সেপ্টেম্বর	ময়মনসিংহ,
ছোলা (হাইপ্রোছোলা)	ফুট অ্যান্ড রুট রট	২৫-৩০ সেপ্টেম্বর	ঈশ্বরদী
সরিষা (সফল ও অগ্রণী)	উইল্ট অ্যান্ড স্টেম রট	১-৭ ডিসেম্বর	ময়মনসিংহ
	অল্টারনারিয়া ব্লাইট	১৫-২৫ ডিসেম্বর	ময়মনসিংহ

৩৬. রোগ-প্রতিরোধী শস্যজাত উদ্ভাবন ও বিস্তার

বিনা এ যাবৎ যে সকল শস্যজাত উদ্ভাবন করেছে, তার বেশ কয়েকটি বিশেষ ধরণের মারাত্মক রোগ প্রতিরোধে সমর্থ, এগুলি হলো-

শস্যজাত	প্রতিরোধের মাত্রা	রোগের নাম
ধান		
বিনাশাইল, বিনাধান-৪, বিনাধান-৫ ও বিনাধান-৬	মাঝারি প্রতিরোধ শক্তি সহনীয়	ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট এবং শিথ ব্লাইট উভয় রোগ
ডাল জাতীয়		
বিনামুগ-১, বিনামুগ-২, বিনামুগ-৩, বিনামুগ-৪ বিনামুগ-৫ ও বিনামাষ-১	মাঝারি প্রতিরোধ শক্তি সহনীয়	সার্কোস্পোরা লিফ ব্লাইট এবং ইয়েলো মোজাইক ভাইরাস উভয় রোগ
তেলবীজ জাতীয়		
সফল ও অগ্রণী বিনাসরিষা-৩ ও বিনাসরিষা-৪	সহনীয় সহনীয়	অল্টারনারিয়া ব্লাইট অল্টারনারিয়া ব্লাইট

বিনা বিজ্ঞানীদের উদ্যোগে উপরিবর্ণিত প্রযুক্তি/বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রতিশ্রুতিশীল ফলাফলের কাজ পরিচালিত হচ্ছে, যা সমাপ্ত হলে জাতীয় বীজ বোর্ড সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে অচিরেই কৃষকদের নিকট হস্তান্তর করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩৭. মাটির স্বাস্থ্য সেবা

নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাটির গুণাগুণ বিশেষণ ও সার ব্যবহার সংক্রান্ত সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে বিনা'র উদ্যোগে ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার দু'টি উপজেলার চাষীদের জন্য মাটির স্বাস্থ্য প্রদান করা হচ্ছে। এই সেবার লক্ষ্য হলো: মাটির উর্বরা শক্তি অক্ষুন্ন রেখে সর্বোচ্চ ফলন আহরণ এবং আবাদি কৃষি জমির ক্ষয়রোধ, যা কেমিক্যাল সারের অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহারের ফলে অহরহ ঘটে থাকে। চাষীগণ ইতোমধ্যে এই সেবার সুফল পেতে শুরু করেছেন।

৩৮. গৃহাঙ্গনে ফলজ উদ্যানের মডেল

সারা বছর যাতে একটি পরিবার ফল পেতে পারে এজন্য বাড়ির উঠানে ফলজ উদ্যানের একটি মডেল তৈরি করেছেন বিনা'র বিজ্ঞানীবৃন্দ। দেশেই পাওয়া যায় এমন নানা ধরণের ফলগাছের ফল ধরা ও

আহরণের সময়ের ওপর ভিত্তি করে এই মডেল তৈরি হয়। দেখা যায় যে, বিভিন্ন মৌসুমে ফল দেয় এমন বারো ধরণের ফলগাছ থেকে একটি পরিবার সারা বছরের জন্য ফলের চাহিদা মেটাতে পারে। এই ফলজ বৃক্ষের অর্ন্তভুক্ত রয়েছে বরই, নারিকেল, পেঁপে, পেয়ারা, কলা, লেবু, বাতাবীলেবু, সফেদা, আমড়া, কাঁঠাল, লিচু ও বারোমাসী আম।

৩৯. বিনাশাইল ধানচাষের উপকারিতা

বিনাশাইল, পাজাম ও নাইজারশাইল ধান চাষ বিষয়ে একটি তুলনামূলক অর্থনৈতিক সমীক্ষা দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, বিনাশাইল চাষ থেকে যে আর্থিক লাভ হয়, তা পাজামের কাছাকাছি এবং নাইজারশাইলের চেয়ে তা ১.৭৬ গুণ বেশি। পাজাম ধান আগাম রোপনের জন্য উপযোগী নয়, পক্ষান্তরে বিনাশাইল ও নাইজারশাইল আগাম রোপনের জন্য উপযোগী। কতিপয় অনিবার্য প্রতিবন্ধকতার কারণে কৃষকদের সাধারণভাবে স্থানীয় জাতের রোপা আমন চাষ করতে হয়। এ রকম ক্ষেত্রে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে বিনাশাইল আবাদ করে চাষীরা সহজেই ১.৭৬ গুণ বেশি আর্থিক লাভ ঘরে তুলতে পারেন।

৪০. ফসল উৎপাদনে পয়োনিষ্কাশিত আবর্জনার ব্যবহার

পয়োনিষ্কাশিত আবর্জনায় রেডিয়েশন প্রয়োগ করে ফসল চাষে ব্যবহার করা হলে তা শুধু রাসায়নিক সারের ব্যবহারকেই হ্রাস করে না, সেই সাথে আবাদি জমির জৈব উপাদানকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশ সংরক্ষণেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। হেক্টরে ১০০ কেজি ইউরিয়া ব্যবহার করে যে ফলন হয়, তা হেক্টর প্রতি ৪০০ কেজি পায়োবর্জ্যের প্রয়োগ থেকে সেই একই পরিমাণের ফলন পাওয়া যায়। এভাবে ফসলের ফলন অনেক বেড়ে যায়।

৪১. নাইট্রোজেন সার হ্রাসে ইউরিয়ার সুপার গ্র্যানিউল

ইউরিয়া সুপার গ্র্যানিউল ধান ক্ষেতের জমির ৮-১২ সে.মি. গভীরে প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সারের ২৫% সাশ্রয় হয়। এই প্রযুক্তি বর্তমানে গুটি ইউরিয়া নামে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

৪২. ধান-ধান শস্য পরিক্রমায় জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সার সাশ্রয়

ভূমিকা: দীর্ঘ মেয়াদী টেকসইভাবে মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখতে লাগসই সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা বর্তমানের দাবি। এ জন্য বিভিন্ন জৈব পদার্থের ব্যবহার যেমন- জায়ান্ট লজ্জাবতীর সবুজ সার ও জায়ান্ট লজ্জাবতীর ব্রাউন ম্যানিউর, ধৈঞ্চা সবুজ সার, ভার্মীকম্পোস্ট প্রভৃতি মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখতে টেকসই ভূমিকা পালন করতে পারে। ফলে রাসায়নিক সারের সহিত এ সকল জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক সার সাশ্রয় করা যায়।

প্রযুক্তির উপযোগীতা:

- বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে ধান-ধান শস্য পরিক্রমায় প্রয়োগ যোগ্য।
- আমন অথবা বোরো ধান ভিত্তিক যে কোন শস্য পরিক্রমায় প্রয়োগ যোগ্য।

প্রযুক্তি থেকে উপকার

১ রোপা আমনে ৭০ রাসায়নিক সারের সহিত ১৩ টন/হে (কাঁচা ৬ টন/হে) জায়ান্ট লজ্জাবতীর সবুজ সার অথবা ১.২৮ টন/হে (কাঁচা ৯.৫ টন/হে) ধৈঞ্চা সবুজ সার প্রয়োগে ১০০% রাসায়নিক সার ব্যবহারের চেয়ে যথাক্রমে ৩.৮% এবং ৬.৩% বেশী ফলন পাওয়া যায় ।

২ বোরোতে ৭৫% রাসায়নিক সারের সহিত ২.০ টন/হে (কাঁচা ৮ টন/হে) জায়ান্ট লজ্জাবতীর বাদামী সার অথবা ৩.০ টন/হে (আদ্র ৪ টন/হে) ভার্মীকম্পোস্ট প্রয়োগে ১০০% রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রায় সমান ফলন পাওয়া যায় ।

অতএব রোপা আমনে জায়ান্ট লজ্জাবতীর সবুজ সার অথবা ধৈঞ্চার সবুজ সার ব্যবহারে ৩০% এবং বোরো ধানে জায়ান্ট লজ্জাবতীর বাদামী সার অথবা ভার্মীকম্পোস্ট ব্যবহার করে ২৫% রাসায়নিক সার (নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং সালফার ঘটিত সার) সাশ্রয় হয়।

৪৩. অঞ্চলভিত্তিক লাভজনক শস্য বিন্যাস

লাভজনক শস্য বিন্যাস	*উপযোগী এলাকা*	*মন্তব্য*
আমন (বিনাধান-৭)- রবি (সরিষা) বিনাসরিষা-৪/ছোলা (বিনাছোলা-৪)/গম (বারিগম ২৬)- খরিফ-১ (মুগ) বিনামুগ-৮/ তিল (বিনাতিল-১, ২ ও ৩)	*বরেন্দ্র অঞ্চলের (রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা)*	*পর্যাপ্ত পানি সাশ্রয় হয় এবং ৬৮% পর্যন্ত বেশি লাভ হয়।*
আমন (বিনাধান-৭)- সরিষা (বিনাসরিষা-৪)- বোরোধান (ব্রিধান ২৮)	*কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর এবং চুয়াডাঙ্গা*	*সরিষা যুক্ত হওয়ায় ৫৮% নীট মুনাফা বৃদ্ধি পায়, শস্যের নিবিড়তা ১০০% বৃদ্ধি পায়।*
আমন (বিনাধান-৭)- সরিষা (বিনাসরিষা-৪)- তোষাপাট	*ফরিদপুর জেলার মধুখালী এবং নড়াইল*	*৩০% নিট মুনাফা বৃদ্ধি পায়।*
আমন (বিনাধান-৭)- মসুর (বিনামসুর-৫/৬)- তিল (বিনাতিল-২)	*নড়াইল, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর এবং চুয়াডাঙ্গা*	*৪৫% নিট মুনাফা বৃদ্ধি পায়।*
আমন (বিনাধান-৭)- সরিষা (বিনাসরিষা-৪)- বোরোধান (ব্রিধান ২৯)	*নেত্রকোনা (হাওর অঞ্চল)*	*প্রচলিত শস্য বিন্যাসের চেয়ে ৫২% অধিক মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং শস্যের নিবিড়তা ১০০% বৃদ্ধি পায়।*

৪৪. ধান সংরক্ষণে পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

গামা রশ্মি ২৪০ গ্রে মাত্রায় প্রয়োগ করে বিনার কোন কোন জাতে প্রয়োগের ৬ দিন পর লাল শুসরি পোকা (Red flower beetle) ১০০% মারা যায় এবং ৩ দিন পর ১০০% শুককীট মারা যায়।

৪৫. মাল্টার কলম করার কলাকৌশল

ক্ল্যাফ্ট গ্রাফটিং বা জোড় কলম এর মাধ্যমে মাল্টার বংশ বিস্তার করা সুবিধাজনক। জোড় কলম অপেক্ষাকৃত সহজ ও সফলতার হার অধিক এবং যেকোন বয়সের রুটস্টক এ কলম করা সম্ভব বিধায় সর্বত্রই এ পদ্ধতিটির ব্যবহার বাড়ছে। জোড় কলমের মাধ্যমে একই প্রজাতির অল্প বয়সের চারা গাছের (রুটস্টক) উপর কাঙ্ক্ষিত জাতের গাছের কান্ডের অংশ (সায়ন) জোড়া লাগানোর মাধ্যমে মাতৃগাছের গুণাগুণ সম্পন্ন গাছ পাওয়া যায়, যা কাঙ্ক্ষিত ফল দানে সক্ষম।

ক্ল্যাফ্ট গ্রাফটিং করার পদ্ধতি

- এলাচী, ট্রাইফোলিয়েট ওরেঞ্জ, টক কমলা, রংপুর লাইম, রাফ লেমন ইত্যাদির যে কোন একটি তিন মাস থেকে এক বছর বয়সী রুটস্টক নির্বাচন করা (চিত্র-১)।
- চলতি মৌসুমের ভাল মাল্টা গাছের গাঢ় সবুজ পাতা, ডগাটি বাদামি সবুজ এবং রোগবালাই ও কীটপতঙ্গের আক্রমণমুক্ত ডালকে সায়ন হিসেবে নির্বাচন করা।

- রুটস্টকের যথাসম্ভব গোড়ার কাছাকাছি কান্ডের সবুজ ও খয়েরী রং এর মিশ্রণ স্থানে রুটস্টকের মাথা কেটে দিতে হবে (চিত্র-২)।
- কাটা মাথার মাঝ বরাবর ধারালো চাকু দিয়ে আনুমানিক ৩-৪ সে.মি. পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ করতে হবে (চিত্র-৩)।

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

চিত্র-৪

চিত্র-৫

পরিপুষ্ট সায়নের সমস্ত পাতা কেটে সায়নের গোড়ার দিকে দুই পাশে তেরছা করে কাটতে হবে যেন সায়নের গোড়ার দিকটা পাতলা পাতের মত হয় (চিত্র-৪ ও ৫)।

- এখন গোড়ার এই পাত মত অংশটি রুটস্টকের ফাটলের ভিতর ঢুকিয়ে যে কোন এক পাশে মিলিয়ে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর পলিথিন ফিতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে (চিত্র-৬, ৭ ও ৮)।
- এরপর জোড়া লাগানো অংশসহ সম্পূর্ণ সায়নটি পলিথিন (৩" রিল পলিথিন) কভার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে (চিত্র-৯)।
- কিছুদিনের মধ্যেই কলম সফল হয়ে নতুন কুঁড়ি বের হবে এবং সায়নে কুঁশি বের হলে পলিথিন ক্যাপ খুলে দিতে হবে।
- রুটস্টক ও সায়নের জোড়ার নিচে রুটস্টকে কুঁশি (অফস্যুট) বের হলে তা ভেঁঙ্গে দিতে হবে।
- সায়নে গজানো পাতা পুষ্ট হওয়ার পরপরই রুটস্টক ও সায়নের জোড়ার পলিথিন কেটে দিতে হবে অন্যথায় জোড়ার জায়গাটি চিকন হয়ে কলমটিকে দুর্বল করে দিতে পারে।
- ৪-৮টি পাতা সবুজ হলে রোদে রাখতে হবে।

চিত্র-৬

চিত্র-৭

চিত্র-৮

চিত্র-৯

জোড় কলমের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ

কলম করার সময় এবং পরবর্তী সময়ে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং অক্সিজেনের সরবরাহ জোড় কলমের ক্যালাস গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২৫-৩৫°C তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতায় ক্যালাস গঠন ত্বরান্বিত হয়। তাপমাত্রা কম বা বেশি হলে ক্যালাস গঠন বিলম্বিত হয়ে যায়। ক্যালাস কোষ থেকে নতুন ক্যাম্বিয়াম কোষের সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে আদিজোড় ও উপজোড়ের আদি ক্যাম্বিয়াম কোষের সাথে এসব নবগঠিত ক্যাম্বিয়াম কোসের যোগসূত্র হয়। এই নতুন ক্যাম্বিয়াম কোষসমূহ অর্থাৎ নতুন ভাস্কুলার টিস্যু ভিতরের দিকে জাইলেম এবং বাহিরের দিকে ফোয়েম টিস্যু তৈরী করে এবং এভাবে আদিজোড় ও উপজোড়ের মাঝে ভাস্কুলার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে, যা জোড়া লাগার পূর্বশর্ত। এই ভাস্কুলার সংযোগ আদিজোড় ও উপজোড়ের মাঝে পানি ও খাদ্যোপাদান চলাচলের ব্যবস্থা করে দেয়।

আমাদের দেশে এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অনুকুল পরিবেশ বজায় থাকে বিধায় জোড় কলমের সফলতার হার বেশি। কিন্তু সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত অনুরূপ পরিবেশ বজায় থাকে না বিধায় উক্ত সময়ে জোড় কলমের সফলতার হার কম হয় এবং আর্দ্রতা খুব কম হলে কলম শুকিয়ে মারা যায়। জোড় কলমের সফলতার জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত রস (রুটস্টকের জন্য), তাপমাত্রা ২৫-৩৫°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-১০০% বজায় রাখতে হবে।

মাঠে চারা রোপণ

কলমের চারাটির বয়স ৪-৫ মাস হলে মাঠে রোপণের উপযোগী হয়। তবে দূরবর্তী স্থানে নেয়ার ক্ষেত্রে গাছটিকে আরো কিছুটা শক্ত করে নেয়া দরকার।

৪৬. সফেদার বংশবিস্তার কলাকৌশল

সফেদার কলমের জন্য জোড় কলম বিশেষ করে “ফাটল জোড় কলম” (Cleft grafting) পদ্ধতিতে খিরনী চারার সাথে সফেদার কলম করা ভাল। সফেদার বীজ থেকে উৎপাদিত চারার সাথে যদি কলম করা হয় তাহলে চারার বৃদ্ধির হার কম হয় এবং গোড়াপচা রোগ হয় এজন্য এর কলম করার জন্য আদিজোড় হিসেবে খিরনীর চারা ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে সফেদা কলমের বৃদ্ধিও ভাল হয় এবং ফলনও বেশী হয়।

ক্যাফ্‌ট গ্রাফটিং করা ও মাঠে চারা রোপন পদ্ধতি

সফেদার জোড় কলম ও মাঠে চারা রোপন পদ্ধতি মাল্টা গাছের পদ্ধতির অনুরুপ।

খিরনীর রুটস্টক

সফেদার সায়ন

ক্ল্যাফ্‌ট গ্রাফটিং এ সফলতার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে-

- আদিজোড় ও উপজোড় অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ এদের মধ্যে পারস্পারিকভাবে যুক্ত হওয়ার মতো অবস্থা থাকতে হবে। এ জন্য আদিজোড় ও উপজোড় যথাসম্ভব নিকট সম্পর্কযুক্ত (একই প্রজাতি অথবা গণের) হতে হবে।
- উপজোড়ের ক্যাম্বিয়াম অঞ্চল অবশ্যই আদিজোড়ের ক্যাম্ভিয়াম অঞ্চলের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংস্থাপিত হতে হবে। অর্থাৎ এ দুটি অংশের মধ্যে কোন রকম ফাকা থাকা চলবে না।
- জোড়া লাগানোর সময় আদিজোড় ও উপজোড় একই রকম শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় থাকতে হবে।
- জোড়া লাগানোর পর ফিতা দ্বারা এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে সংযোগস্থান বায়ুরোধী থাকে এবং রৌদ্র তাপে সেখান থেকে পানি বাস্পীভবন কম হয়।
- জোড়া লাগানোর পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জোড়কলমের উপযুক্ত যত্ন নিতে হবে। অর্থাৎ এ সময় সংযোগ স্থানের নিচ থেকে জন্মানো কুঁশি বা বিটপসমূহ ভেঙ্গে দিতে হবে।
- সঠিক মৌসুমে সঠিকভাবে নির্বাচিত আদিজোড় উপজোড় দ্বারা জোড়কলম করতে হবে। তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, রোগ-বালাই প্রভৃতি জোড়া লাগানোর উপর প্রভাব ফেলে।

৪৭. পেয়ারার সাদা মাছি দমন ব্যবস্থাপনা

পেয়ারার পরিপক্ক পাতার সাদা মাছি দমন করতে ১০ গ্রাম হুইল পাউডারের সাথে ৩ গ্রাম মরিচের গুড়া ১ম বার স্প্রে করলে প্রায় সব মাছিই মারা যায়। তবে দু'একটি মাছি থাকলে ২য় বার স্প্রে করলে সম্পূর্নরুপে সাদা মাছি দমন করা সম্ভব। পেয়ারা গাছের কচি পাতার ক্ষেত্রে ৫ গ্রাম হুইল পাউডারের সাথে ৩ গ্রাম মরিচের গুড়া মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সাদা মাছি দ্বারা আক্রান্ত পেয়ারার পাতা

৪৮. সরিষা, বোরো, রোপা আমন শস্য বিন্যাসে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে জৈব ও অজৈব সারের ব্যবস্থাপনা

সরিষা, বোরো, রোপা আমন শস্য বিন্যাসে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুপারিশকৃত অজৈব সারের সাথে ৫ টন সরিষার খড়/৫ টন ধানের খড়/৫ টন গোবর/৩ টন মুরগীর বিষ্ঠা/৩ টন ভার্মিকম্পোস্ট এর ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয়েছে। এ শস্য বিন্যাসে সরিষার ক্ষেত্রে বিনাসরিষা-১০, বোরো ধানের ক্ষেত্রে বিনাধান-১৪ এবং আমন ধানের ক্ষেত্রে বিনাধান-৭ ব্যবহার করে পরীক্ষণের ফলাফলে দেখা গেছে যে, সুপারিশকৃত মাত্রার অজৈব সারের সাথে ৩ টন ভার্মিকম্পোস্ট মিশ্রন প্রয়োগে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া গেছে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪৯. লবণাক্ত এলাকায় ফারো রোপন পদ্ধতি

রিজ এবং ফারো রোপণ (ফারো ৩০ সে.মি., রিজ ৩০ সে.মি., প্রতি ফারোতে ৩ লাইন চারা রোপন) পদ্ধতিতে জিপসাম (১৫০ কেজি/হে.) ও সিলিকন (সিলিকন ১০ কেজি/হে.) প্রয়োগের মাধ্যমে লবণাক্ততা হ্রাস করে বোরো ধানের ফলন ২৫-৩০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

রিজে লবণ

বিনাধান-৭

বিনাধান-১৯

বিনাধান-২১

বিনাধান-২২

বিনাসরিষা-১০

বিনামুগ-৮

বিনামরিচ-১

বিনারসুন-১